মনের গভীরে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

হেমন্তদা,

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইন্দ্রলোকের সঙ্গে আপনিই আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। অঞ্জনার তীরে আমার কৈশোরের সেই স্বপ্নময় দিনগুলির সঙ্গে আপনি জড়িয়ে আছেন। সে দিনের সেই দানের কথা স্মরণ ক'রে এই গ্রন্থ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আপনাকে উৎসর্গ করলাম।

বিজয়

ভূমিকা

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ Dr William Stekel কর্ত্তৃক লিখিত The Depths of the Soul বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে দান ক'রেছে একটী অমূল্য সম্পদ। এই নাম-করা বইখানিকে ভিত্তি ক'রে লেখা হয়েছে 'মনের গভীরে'র প্রবন্ধগুলি। এই প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্ব্বে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়েছিল।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আচরণগুলিকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদেরই মনের গোপনে যারা লুকিয়ে থাকে সেই সব চিন্তার প্রভাব। ফ্রয়েডের এই আবিষ্কারকে সত্য ব'লে মেনে নিতে আমাদের যদি কোনো বাধা না থাকে তবে মনোবিকলনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো। এই আলোচনা আমাদের দান করবে সেই দৃষ্টি যার সাহায্যে নিজেকে সম্যকরূপে জানার পথ প্রশস্ত হবে। দেহের নগ্নতাকে আমরা সহ্য করতে শিখেছি, কিন্তু মনের উলঙ্গরূপকে দেখতে আমরা এখনও অভ্যস্ত হই নি। সাইকো-এ্যানালিসিস মনের এই উলঙ্গরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। নিজের সঙ্গে নিজের এই গভীর পরিচয়ের একান্তই প্রয়োজন আছে জীবনকে কল্যাণের শুভ্র দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় করবার জন্য। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের নোংরামিকে দূর করবার জন্যও কি মনোবিকলতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন নেই? নিজেকে ভালো ক'রে জানিনে—এইখানেই তো গলদের মূল।

বিজয় চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১।	মনের খেলা	১৲
২।	রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ	১৲
৩।	অগ্রদূত	১৲
৪।	সাম্যবাদের গোড়ার কথা	১।০
৫।	কমিউনিজম্	৸০
৬।	স্বর্গের ঠিকানা	৸০
৭।	রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র	৸০
৮।	মরু-জয়ের সেনা	॥০
৯।	সর্বহারাদের গান	॥০
১০।	সাম্যবাদের মর্ম্মকথা	॥০
১১।	ঘরের মায়া	।৵০
১২।	রাসিয়ার কথা	।০
১৩।	মানুষের অধিকার	।০
১৪।	বঙ্কিমের স্বপ্ন	৵০
১৫।	অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ	৵০
১৬।	ত্রয়ী	।০
১৭।	সেনাপতি গান্ধী (যন্ত্রস্থ)	॥০
১৮।	সভ্যতার ব্যাধি	৵১০

মনের গভীরে

সুখের মরুমায়া

নদীর এপারে দাঁড়িয়ে মনে হয় ওপার ভালো, আবার ওপারে গেলে মনে হয় এপারই ছিলো ভালো। এ পৃথিবীর যা কিছু সৌন্দর্য্য—তাদের অস্তিত্ব শুধু আমাদের কল্পনায়। বাস্তবের মধ্যে যখনই সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে যাই তখনই দেখি, সুন্দর কখন পালিয়ে গেছে নাগালের বাইরে—যেমন ক'রে জল পালিয়ে যায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে। তুমি, আমি—সবাই সুখকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি—যেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথরকে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছে। কিন্তু যার জন্য এত খোঁজাখুঁজি—তার তো দেখা পেলাম না কেউ! সৌন্দর্য্য কোথায়? তৃপ্তি কোথায়? কোথায় সেই চির-সুন্দর স্বপ্নের দেশ যেখানে সব কান্নার অবসান ঘটেছে প্রাপ্তির পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে? না, প্রাপ্তির মধ্যে আনন্দ নেই, আছে কেবল ক্লান্তি। আকাঙ্ক্ষার ধনকে যখনই আমরা পেয়ে যাই মুঠোর মধ্যে, তখনই হৃদয়ের মধ্যে আসন পাতে নৈরাশ্য। সুখ—সে কেবল সুখের স্বপ্ন দেখায়। তার অস্তিত্ব শুধু ভবিষ্যতের বুকে।

আমাদের ভবিষ্যতকে কতরকমের রঙীন কল্পনা দিয়েই যে আমরা ভরিয়ে রাখি! সেখানে সারাবেলা কেটে যায় শুধু কূজনে আর গুঞ্জনে। বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-রাত্রিগুলি পূর্ণ হয়ে আছে কোমল কণ্ঠের কানে-কানে-বলা সোহাগ-বাণীতে! ঘুমন্ত প্রিয়ার কমনীয় মুখচ্ছবিকে প্রদীপের আলোয় বারম্বার চুরি ক'রে দেখেও তৃপ্তি নেই প্রাণে! তারপর আসে সেই মিষ্টতায় আর তিক্ততায় ভরা জীবনের অপরূপ মুহূর্ত্তটি যখন ভবিষ্যত ধরা দেয় বর্ত্তমানের বাহুর মধ্যে—যা ছিলো কল্পনায়, তা অবশেষে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। বাতায়ন-পথে দেখা যেতো যার অঞ্চলের প্রান্তটুকু—সে একদিন দেখা দেয় বাসর-ঘরে শয্যার সঙ্গিনী হয়ে। মুগ্ধ তরুণ ভাবে, স্বর্গকে পেয়ে গেলাম হাতের মধ্যে। আনন্দের প্রাচুর্য্যের মধ্যে কাটে দিন, মাস, বৎসর। তারপর স্বপ্নের ঘোর একদিন কেটে যায়। যে মুখখানিকে একদা মনে হোতো পূর্ণিমার চাঁদের মতই সুন্দর—সে মুখ দেখে আর কবিতা লেখার প্রেরণা জাগে না! যার কঙ্কন-ঝঙ্কার একদিন রক্তে দিতো দোলা—তার অস্তিত্ব অবশেষে ডাল-ভাতের অস্তিত্বের মতোই অতি সাধারণের পর্য্যায়ে নেমে আসে। স্বপ্নময়ী স্বর্গের অপ্সরী কস্তা-পেড়ে-কাপড়-পরা, হাতা-বেড়ি আর খুন্তি-ধরা কলেবরবিশিষ্টা গৃহিণীতে পর্য্যবসিত হয়! যাকে সপ্তাহে রোজ একখানা চিঠি লিখেও হৃদয়াবেগ প্রশমিত হোতো না—অবশেষে এমন একদিন আসে, যখন তাকে পোষ্টকার্ডে দু-এক ছত্র চিঠি লেখাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়! বিয়াট্রিসের সৌন্দর্য্য দান্তের কবি-চিত্তকে যে ক্লান্ত করতে পারে নি কখনো

—তার কারণ একজন আর একজনের ঘরের মধ্যে আসেনি পরিণীতা বধূ হ'য়ে। বিয়াট্রিস আর দান্তের প্রেমকে আমরণ অম্লান রেখেছে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান।

যে কথাটা রূপের বেলায় সত্য, সে কথাটা খ্যাতির বেলাতে মিথ্যা নয়। খ্যাতি যাদের কাছে দুর্লভ, তারাই মনে করে লোকের কাছ থেকে বাহবা পেলেই মনের কান্না ঘুচে যায়! হায় রে, হাততালি আর পুষ্পমাল্য হৃদয়ের শূন্যতাকে যদি ভরাতে পারতো! যশের মুকুট নাগালের বাহিরে থাকে যত-দিন, ততদিনই কীর্ত্তিকে মনে হয় সকল সুখের আকর। ভুল ভেঙে যায় সেই দিন যেদিন যশোলক্ষ্মী জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে গলায় দুলিয়ে দেয় বিজয়ীর বরমাল্য! নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া বিশ্বকবির অন্তরের মধ্যেও ঘনায় শূন্যতার বেদনা। রবীন্দ্রনাথের 'পথে ও পথের প্রান্তে' বইখানির এক জায়গায় কবি লিখেছেন,

কিন্তু সত্যিকথা বলি তোমাকে, খ্যাতি সম্মান পেয়েছি প্রচুর, তবু মন ভারত-সমুদ্রের পারের দিকে তাকিয়ে থাকে! শান্তিনিকেতন থেকে খুকু লিখেছে, "কাল খুব ঝমাঝম বৃষ্টি গেছে, আজ সকালে উঠেছে কাঁচা সোনার মতো রোদ"—ঐ কথা ক'টা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে, মন ধড়পড় করে উঠলো, আচ্ছা, তাই সই, যাব সেই অধ্যাপকবর্গে, তারা যদি আমাকে বেঞ্চের উপরে দাঁড় করিয়ে দেয় তবু তো খোলা জানালা দিয়ে কাঁচা সোনার মত রোদ পড়বে আমার ললাটে, সেই হবে আমার বরমাল্য।

চিঠির মধ্যে এই যে ফুটে উঠেছে একটা চাপা অভিমানের সুর, এর মধ্যে আমরা যশস্বী কবির হৃদয়ের তৃপ্তিকে তো

আবিষ্কার করতে পারিনে। সাত সমুদ্রের কূলে কূলে শোনা যায় যাঁর খ্যাতির দুন্দুভি-নিনাদ—তিনি তো ভুলতে পারেন নি তাঁর দেশবাসী পণ্ডিতদের ঔদাসীন্যকে। দেশের পণ্ডিতেরা যে তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করেছে—এই অনাদরের বেদনা তাঁর চিঠির আরও অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে। যে পত্র থেকে উপরের লাইনগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তারই অন্যত্র আছে,

"আসল কথা, স্বদেশ থেকে বিদেশে এলেই আত্মগৌরব অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। যার কপালে ঠাণ্ডা জলও জোটে না—সে হঠাৎ পায় শ্যাম্পেন।"

'যার কপালে ঠাণ্ডা জলও জোটেনা'—এই আহত অভি-মানের সুর তাঁরই কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে যাঁর কীর্ত্তি-কিরণ ছড়িয়ে প'ড়েছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত। স্বদেশের অগণিত মানুষের জয়ধ্বনির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ আপনাকে মনে করেন উপেক্ষিত এবং নিরাশ্রয়; আঘাতের বেদনাকে ভুলবার জন্য পীড়িত কবি-হৃদয়, তাই, সান্ত্বনা খুঁজেছে জন্মভূমির আকাশের নির্ম্মল আলোর কাছে, যে আলো তাঁর ললাটে পরিয়ে দেবে বরমাল্য। বিশ্বজোড়া খ্যাতির মুকুট প'রেও মানুষ যদি আপনাকে এমন নিঃসঙ্গ এবং অনাদৃত মনে করে, তবে কেমন ক'রে বলবো—যশোলক্ষ্মীর অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করতে পারলেই আমরা সুখী হ'তে পারবো? প্রাপ্তিতে সত্য সত্যই কোনো সুখ নেই। পাওয়ার সম্ভাবনাতেই সুখ। যে মুহূর্ত্তে ঈপ্সিতকে পেয়ে গেলাম সেই মুহূর্ত্তেই সুরু হোলো ক্লান্তি। আবার সুরু হয় নতুন ক'রে চাওয়ার পালা; সে

চাওয়া পাওয়ার মধ্যে যখন সফল হোলো—তখন পুনরায় অন্তরে ঘনায় নৈরাশ্যের মেঘ। জীবন-ঘড়ির দোলক এমনি ক'রে ক্রমাগত দুলছে আশা থেকে নিরাশায়, নিরাশা থেকে আশায়। আকাঙ্ক্ষার যেখানে পরিতৃপ্তি—ক্লান্তির সেখানে আরম্ভ।

রূপের বেলায়, খ্যাতির বেলায় যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, ঐশ্বর্য্যের বেলাতেও কি সেই একই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না? যারা গরীব তারা মনে করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা—তাদের জীবন একটা অন্তহীন সুখ। দারিদ্র্যের অন্ধকূপ থেকে ঐশ্বর্য্যের শিখরে আরোহণ করেছে যারা, তারা কিন্তু গরীবের এই ধারণাকে ভ্রমাত্মক বলে। Too True To Be Good ব'লে বার্ণার্ড শ'য়ের একখানা নাটক আছে। এই নাটকখানিতে শ' এক ধনী-কন্যার অসীম দুর্ভাগ্যের ছবি এঁকেছেন। নাটকের উপক্রমণিকায় বার্ণার্ড শ' নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার এই বর্ণনা দিয়েছেন :—

"For just as the beanfeaster can live like a lord for an afternoon, and the Lancashire operative have gorgeous week at Blackpool when the wakes are on, so I have had my afternoons as an idle rich man, and know only too well what it is like. It makes me feel suicidal."

অর্থাৎ "শাকভাত খেয়ে যে দিন কাটায়, সে যেমন কখনো কখনো পোলায় মাংস খায়, ল্যাঙ্কাশায়ারের কলের মজুর যেমন সপ্তাহের শেষে ব্ল্যাকপুলের মেলায় গিয়ে ছুটির আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি আমিও

কখনো কখনো অলস ধনকুবেরদের জীবন যাপন ক'রে দেখেছি। কি তিক্ত সেই জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা! আত্মহত্যা ক'রে মরতে ইচ্ছা করে।"

ধনীরা খুব সুখী এবং দরিদ্রেরা খুব দুঃখী—এই ধারণাই জগতে চলে এসেছে বরাবর। কত ভুল এই ধারণা—গরীবেরা তা জানে না, কারণ, আজীবন তাদের কাটাতে হয় বৈচিত্র্যহীন দারিদ্র্যের মধ্যে। ঐশ্বর্য্যশালী ধনীরা কেমন জীবন যাপন করে, তার ধারণা করে তারা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে। কল্পনায় দূর থেকে যা সুন্দর লাগে, বাস্তবের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাকে আর তেমন সুন্দর ব'লে মনে হয় না। সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষের চিত্ত যদি তার তৃপ্তি খুঁজে পেত—তবে ক্রোপটকিন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় থেকে ধূলায় নেমে এসে বিপ্লবীর ভাগ্যকে বরণ করতেন না, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলকে আমরা দেখতে পেতাম না ক্রিমিয়ার হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীর মূর্ত্তিতে, এ্যাডমিরাল-কন্যা শ্রীমতী শ্লেডও ভারতবর্ষে আসতেন না গান্ধীর শিষ্যা হয়ে। বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে কত দেশবন্ধু আর মতিলালকে আমরা দেখলাম দুঃখ-পথের পথিক হ'তে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁদের চিত্ত নিশ্চয়ই দুর্ব্বহ ক্লান্তি অনুভব করেছিলো এবং সেই জন্যই ত্যাগের পথকে বেছে নেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়নি।

জীবন যতদিন তার বিপুল রহস্য নিয়ে আমাদের কাছে অজানা ছিলো, ততদিন ছিলো আমাদের সুদিন। সেই ছেলে-বয়সের সোনালি প্রভাতে ভবিষ্যতের রাজ্যগুলি আমাদের

চোখের সামনে বিস্তীর্ণ হ'য়ে ছিলো কলম্বাসের সামনে আমেরিকার মত। আমাদের যাযাবর ইচ্ছাগুলি আপনাদের খেয়ালমতো উড়ে যেতো সেই রাজ্যগুলির উপর দিয়ে। আমরা নেপোলিয়ান হয়ে জয় করতাম অষ্টারলিজের সমর, অভিমন্যু হয়ে লড়াই করতাম সপ্তরথীর সঙ্গে, ক্যাপ্টেন কুক হ'য়ে জাহাজে চড়ে পরিভ্রমণ করতাম সাগরে সাগরে, মাঙ্গো পার্ক আর লিভিংষ্টোন হয়ে আবিষ্কার করতাম আফ্রিকার অরণ্যগুলি, বঙ্কিমচন্দ্রের মত লিখতাম অমর উপন্যাস, রবীন্দ্র-নাথের মত জয় করতাম নোবেল প্রাইজ, বিপিন পালের মত বক্তৃতা দিয়ে মাতিয়ে দিতাম জনতাকে, রামমূর্ত্তির মত বুকের উপরে রাখতাম হাতী, শিব ভাতুড়ি হ'য়ে খেলার মাঠে দেখাতাম বল নাচানোর বাহাতুরি। সেদিন সামনে প'ড়ে ছিলো অন্তহীন সম্ভাব্যতা। সাঁতারু, শিকারী, মল্লবীর, খেলোয়াড়, ঘোড়শোয়ার, কবি, বৈজ্ঞানিক, গায়ক—ইচ্ছা করতো সব-কিছুই হই এবং মনে হোতো কোনো কিছু হওয়াই অসম্ভব নয়। জগতকে মনে হোতো রূপকথার রহস্যময় রাজপুরীর মত—যার ঘরে ঘরে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে আমার হাতের সোনার কাঠির স্পর্শ পাবার জন্য।

তারপর এলো ছেলেবেলার যাযাবর ইচ্ছাগুলিকে সফল করবার তুর্দ্দিন। মনের মধ্যে যারা ইচ্ছা হ'য়ে ছিলো, তারা একে একে জীবনে নেয় রূপ আর সুখের পর সুখ যায় ধূলায় চূর্ণ হ'য়ে। যারা ছিলো নাগালের বাইরে আকাজ্ক্ষার বস্তু হ'য়ে, তারা যখন বয়সের সঙ্গে একে একে বাস্তবের মধ্যে সত্য

হ'য়ে ওঠে তখন ছেলেবেলার স্বপ্নের জগত থেকে সরে যায় অপরূপের শ্যামল মায়া, অকরুণ ধূসর বাস্তবের মধ্যে বিশ্ব দেখা দেয় তরুলতাহীন ন্যাড়া পাহাড়ের মত নিতান্তই সাধারণ হ'য়ে।

কেন আমরা দূরের মোহে এমন ক'রে মুগ্ধ হই? এই মোহের কি কোন মানে আছে? সুখ পাবো ব'লে এতকাল ধ'রে কতকিছুর পিছনেই না ছুটলাম! আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি একটার পর একটা ক'রে এসেছে নাগালের ভিতরে আর সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্যের ঘটেছে মৃত্যু! কত সুখের মৃতদেহের উপর দিয়ে চ'লে এলাম যৌবনের শেষসীমায়, তবুও সুখের অন্বেষণের আজও বিরাম নেই! এ যেন ছেলেদের জাল দিয়ে প্রজাপতি ধরার মতো। একটার পর একটা প্রজাপতি জালে পড়ে—আবার নতুন প্রজাপতির সন্ধানে চলে তারা। আমরাও সুখের প্রজাপতি ধরবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছুটেছি। প্রজাপতির পর প্রজাপতি আমাদের হাতের মধ্যে আসছে, তাদের পাখার স্বর্ণধূলি লেগে যাচ্ছে আমাদের অকরুণ আঙ্গুলে আর তাদের মৃতদেহগুলি লুটিয়ে পড়ছে ধূলায়। আমাদের হৃদয় সত্যসত্যই সমাধিভূমির মতো। কত ছিন্ন আশা, কত ভগ্ন আকাঙ্ক্ষা, কত ব্যর্থ স্বপ্ন, কত মৃত সুখের কঙ্কালে সেই সমাধিভূমি আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আমরা কি পাগল! অন্যের ভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রে জীবনের পানপাত্র তিক্ত গরলে পূর্ণ ক'রে তুলি। আমরা কি জানিনে অন্যের ভাগ্যকে ঈর্ষা করবার সত্যি সত্যি কোনো কারণ নেই?

দূর থেকে সব জিনিষই মধুর লাগে—দূরের জিনিষ কা'ছে এলে তাদের আর কোনো মাধুর্য্য থাকে না। যারা বিয়ে করে নি, তারা ভাবে বিবাহিত লোকগুলির জীবন কি সুখময়! ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্ত্রীর আদর-যত্ন পেয়ে কি সুখেই আছে তারা! পক্ষান্তরে যারা বিয়ে করেছে তারা ভাবে—স্ত্রীপুত্রের বালাই নেই যাদের, সংসারের বন্ধন থেকে যারা মুক্ত, তারা না জানি কতই ভাগ্যবান! তাদের না আছে ছেলের অসুখে উদ্বেগ, না আছে কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা, না আছে অনুক্ষণ স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলবার বিড়ম্বনা। মুক্তির আনন্দে চলেছে তারা বিভোর হ'য়ে! এমনি ক'রেই একদল আর একদলকে বৃথাই ঈর্ষা ক'রে আসছে এবং আমরা ভালো করেই জানি, এই ঈর্ষার মূলে রয়েছে নির্ব্বুদ্ধিতা—মূঢ়চিত্তের সুদূরের মোহ।

সেদিন কলেজের একজন অধ্যাপক বলছিলেন, সংবাদপত্র-আফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে কোনো চাকরি খালি থাকলে তিনি করেন। সখ মন্দ নয়! বছরের মধ্যে ছুটির দিন আঙ্গুলে গণনা করা যায়! দিনের পর দিন লিখে চল প্রবন্ধ। যারা আবার খবরের কাগজে কাজ করে, তারা মনে করে অধ্যাপকের কাজের মতো কি কাজ আছে! সপ্তাহে দু' তিন ঘণ্টা ক্লাস আর এন্তার ছুটি! লেখক যে, সে মনে করে ডাক্তারের পেশা কি সুন্দর! ডাক্তারি ক'রে সমাজের কত উপকার করা যায়, সমালোচকের তীব্র কষাঘাত সহ্য করতে হয় না, স্বাধীন ব্যবসা, পাঠকের মন যুগিয়ে চলবার বালাই নেই কোনো। ডাক্তার আবার ভাবে, লেখকের পেশার মতো কি আর

পেশা আছে? দিন নেই, রাত নেই, রোগীর বাড়ী থেকে লোক এসে দুয়ারে কড়া নাড়লেই ওষুধের ব্যাগ নিয়ে ছোটো! দু'দিন ছুটি নিয়ে কোথাও যাবার পর্য্যন্ত যো নেই—তা হ'লেই রোগী হাত-ছাড়া হ'য়ে যাবার আশঙ্কা! আর মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার গৌরবের কথা! মৃত্যু যখন সত্য সত্যই আসে রোগীর শিয়রে—তাকে বাঁচাতে পারে কোন্ চিকিৎসক?

এমনি করেই আমরা একজন আর একজনের ভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রে চলেছি। স্বাধীন ব্যবসায়ের নামে চাকুরিজীবীর মন লাফিয়ে ওঠে। মনে করে, একজন ডাক্তার, উকীল, দোকানদার, নিতান্ত পক্ষে যদি গ্রামের একজন ছুতোরও হ'তে পারতাম, তবে দাসত্বের বোঝা কাঁধ থেকে নেমে যেতো! বেচারা জানে না—একজন দোকানদার, ডাক্তার অথবা উকীল রোগীর আর মক্কেলের আর ক্রেতার কতখানি ক্রীতদাস!

মুক্তি আছে জীবনে। কিন্তু সে মুক্তির দেখা বাইরে পাবো না! বাইরের দিক থেকে পূর্ণ মুক্তির আস্বাদন পাওয়া অসম্ভব। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য পরের মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে থাকতেই হবে! কিন্তু ভিতরের দিক থেকে মুক্ত হবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণই আছে। বেশী চাইতে নেই—কারণ, যা চাই তার প্রাপ্তিতে আছে ক্লান্তি। বাসনাকে ত্যাগ করতে পারলেই ভিতরে মুক্তির আনন্দকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ত্যাগের মধ্যেই অমৃতত্ব আছে আর আসক্তিকে যে ত্যাগ করতে পেরেছে, সে পর্ণকুটিরবাসী কৃষক হলেও ধনকুবেরের চেয়ে অনেক বেশী মুক্ত।

আমরা সবাই জানি সেই রাজার সুন্দর গল্পটি যাঁকে চিকিৎসকেরা নিরাময় করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—একটি সর্ত্তে। রাজাকে এমন একজন মানুষের কোর্ত্তা পরিধান করতে হবে যার অন্তরে নেই কোনো দুঃখের ছায়া। খোঁজ্! খোঁজ্! রাজার অনুচরেরা দিগ্বিদিকে চললো সুখী মানুষের সন্ধান করতে। কিন্তু সুখী মানুষ কোথায়? অবশেষে তারা এক গহন অরণ্যের মধ্যে দেখলো জনৈক তপস্বীকে যার মুখে আনন্দের অনাবিল হাসি। কিন্তু হায়, হায়, এত অনুসন্ধানের পরে যে সুখী মানুষটিকে পাওয়া গেলো তার অঙ্গে নেই কোনো কোর্ত্তা! সে সম্পূর্ণ নগ্নকায়!

আমরাও যদি সুখী হতে চাই, মুক্ত হ'তে চাই, তবে হ'তে হবে ওই নগ্নকায় সন্ন্যাসীর মত। আমাদের খুলে ফেলতে হবে কোর্ত্তার পর কোর্ত্তা, যারা আমাদের সদামুক্ত আত্মার উপরে চেপে আছে বোঝা হ'য়ে। এই কোর্ত্তাগুলি কি আমাদের আসক্তি নয়? নামের জন্য আসক্তি, রূপের জন্য আসক্তি, ধনের জন্য আসক্তি, প্রাণের জন্য আসক্তি, সুখের জন্য আসক্তি, পুণ্যের জন্য আসক্তি। আসক্তিই তো আমাদের বেঁধে রেখেছে দুঃখের কারাগারে। আসক্তি যখন থাকবে না, তখনই মুখে ফুটে উঠবে নগ্নদেহ সন্ন্যাসীর আনন্দের জ্যোতি!

আমাদের কল্পজগৎ

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে দুটো ক'রে জগত আছে। একটা হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্যের ধূসর জগত—আর একটা হচ্ছে আমাদের কল্পনার রঙীন জগত। দৈনন্দিন জীবনের বাঁধা-ধরা কর্ত্তব্যের পথকে অনুসরণ ক'রে যেখানে আমাদের চলতে হয়, সেখানে আমরা তৃপ্তির সন্ধান পাইনে। তৃপ্তি পাইনে ব'লেই স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য যে কাজ করতে আমরা বাধ্য হই, তার নাম দিয়েছি আমরা 'দিনগত পাপক্ষয়।' এই দিনগত পাপক্ষয়ের জন্যই উকীলকে সামলা প'রে ছুটতে হয় আদালতে, ছুরি-কাঁচি নিয়ে ডাক্তারকে দাঁড়াতে হয় অপারেশন টেবিলে, সম্পাদককে ঘাড় গুঁজে লিখতে হয় খবরের কাগজের প্রবন্ধ, এজলাসে ব'সে জজসাহেবকে শুনতে হয় ব্যারিষ্টারদের জেরা, সকাল-সন্ধ্যায় অধ্যাপকদের দেখতে হয় পরীক্ষার খাতা, প্রত্যূষে ঝাড়ুদারকে পরিষ্কার করতে হয় সহরের রাস্তাঘাট, বাড়ীর ঝি-চাকরকে মাজতে হয় এঁটো বাসনের গাদা, সারাদিন সারারাত্রি জেগে ড্রাইভারকে চালাতে হয় রেলের ইঞ্জিন। কর্ত্তব্যের এই দায়কে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও। বাস্তবের দাবীকে মেটাবার জন্য কাজের দাসত্বকে অল্পবিস্তর স্বীকার ক'রে নিতে হয় সবাইকেই। কিন্তু দায়ে প'ড়ে যাকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, তার মধ্যে আমাদের চিত্ত তার তৃপ্তিকে খুঁজে পায় না।

এই জন্যই আমাদের সৃষ্টি করতে হয় দ্বিতীয় একটা জগতকে যেখানে কর্ত্তব্যের শাসনকে স্বীকার করবার আদৌ কোনো প্রয়োজন থাকে না। এই যে আমাদের দ্বিতীয় জগত—এখানে আমরা ভুলে থাকি বাস্তবের কদর্য্যতাকে। এখানে হাস-পাতালের রোগীর আর্ত্তনাদ চিকিৎসকের চিত্তকে পীড়িত করে না, গৃহিণীর দীর্ঘ ফর্দ্দের চিন্তা গৃহ-স্বামীর মনের অবচেতন প্রদেশে আশ্রয় লয়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার স্কন্ধ থেকে কিছুক্ষণের জন্য নেমে যায় দুর্ভাবনার বোঝা। বাস্তবের সহস্র আঘাতকে ভুলিয়ে দেবার জন্য কল্পনার এই দ্বিতীয় জগত যদি না থাকতো, আমাদের এই পৃথিবী হ'য়ে উঠতো অশ্রুর কূলহীন সমুদ্র। আমাদের রিক্ত, তপ্ত, ক্লান্ত হৃদয় কোথাও খুঁজে পেতোনা তার সান্ত্বনা।

ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের দ্বিতীয় জগত হ'চ্ছে খেলার জগত। এই খেলার জগতের মধ্যে তাদের সমস্ত হৃদয় মগ্ন হ'য়ে থাকে। সেখানে তারা বাপ-মা হ'য়ে পুতুলের বিয়ে দেয়, গৃহিণী সেজে ঘরকন্না করে, রাজপুত্র সেজে রাজকন্যা বিয়ে ক'রে আনে, খেয়াঘাটের মাঝি হ'য়ে নৌকা চালায়, তীর মেরে রাক্ষসদের মৃত্যু ঘটায়, ধনুর্ব্বাণ হাতে বনবাসে যায়, দারোগা হয়ে ডাকাত ধরে, কল্পনায় আপনাদিগকে আরও কত কি মনে ক'রে খেলার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। স্নানের জন্য, খাওয়ার জন্য ডেকে ডেকে মা সাড়া পায় না। ছেলে-মেয়ের স্বপ্ন-ভরা মন তখন পক্ষীরাজের পিঠে চ'ড়ে আকাশের তারায় তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নয়তো পাতালপুরীর নাগকন্যাদের স্বপ্ন দেখছে।

তারপর আসে একদিন হাতে-খড়ির দুর্দ্দিন, গুরুমশাইয়ের ধমক ভেঙে দেয় শিশুর কল্পনার জগতকে, নূতন পড়ুয়াকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করতে হয় বর্ণমালার নীরস অক্ষরগুলির সঙ্গে, স্বপ্নের দ্বিতীয় জগত শিশুর জীবনে গৌণস্থান অধিকার করে, মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায় কর্ত্তব্যের প্রথম জগত।

ছেলেদের দ্বিতীয় জগত যেমন খেলাধূলার মধ্যে—তেমনি অসংখ্য সরল-মনা বয়স্ক লোকদের কাছে দ্বিতীয় জগত হ'চ্ছে তাদের ধর্ম্ম। প্রথম জগতে যারা মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে দারিদ্র্যের অভিশাপ আর লাঞ্ছনা—তারা কল্পনা দিয়ে তৈরী করেছে তাদের দ্বিতীয় জগতকে আর সেই দ্বিতীয় জগতে তাদের মাথার উপরে অবিরতধারে ঝ'রে পড়ছে বিধাতার করুণাধারা। সেখানে দৈন্যের দুঃখ নেই, প্রবলের অত্যাচার নেই—আছে কেবল ভগবানের চরণতলে ইহলোকের সকল দুর্ভাগ্যের চরম পরিসমাপ্তি। বলা বাহুল্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের এই যে কাল্পনিক দ্বিতীয় জগত—এই দ্বিতীয় জগতের অস্তিত্বই অন্যায়ের শাসনকে বহুকাল ধ'রে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলো। সেই শাসনের ভিত্তি তখন থেকেই শিথিল হ'তে আরম্ভ করেছে যখন থেকে শিক্ষার এবং সংস্কৃতির প্রসার প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির মূলে হেনেছে আঘাত। লাঞ্ছিত, সর্ব্বহারা মানুষ মনের মধ্যে স্বর্গের যে ছবিখানি এঁকে রেখেছিলো—প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির অসারতা প্রতিপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিখানিও লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্তপট থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। ইহকালের দুঃখ-বেদনাকে ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করবার শক্তি দিচ্ছিলো পরকালের আশা। সেই

আশা যখন থেকে নির্ম্মূল হয়ে গেলো তখন থেকে লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার মনে জ্বলে উঠলো প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের দাবাগ্নি-শিখা। কোটী কোটী মানুষের মনের মধ্যে বিপ্লবের বাসুকীনাগ আজ তার লক্ষ ফণা মেলে গর্জ্জন করছে। স্বর্গের ফাঁকি দিয়ে এ গর্জ্জন তো থামানো যাবে না। এমন কিছু তাদের হাতে আজ দিতে হবে যা মেকি নয়—খাঁটি, যা কল্পনা নয়—সত্য, যা ইহকালে তাদের মুক্ত করবে দৈন্যের অভিশাপ থেকে। যতদিন আমরা সেই সত্য বস্তুকে না দিতে পাচ্ছি, ততদিন অসন্তোষ বেড়েই যাবে, হ্রাস পাবে না।

খেলার এবং ধর্ম্মের মতো সঙ্গীতও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বহন ক'রে আনে এমন একটী সান্ত্বনা যা অবর্ণনীয়। গান যে আমাদের সকলেরই এতো প্রিয়—তার কারণ, জননীর মত দুবাহু প্রসারিত ক'রে সে আমাদের টেনে নেয় তার মধুময় বুকে। সেই আলিঙ্গনের মধ্যে আমাদের দুঃখ-সুখের, আশা-নৈরাশ্যের অনুভূতি একসঙ্গে মিশে গিয়ে সুর হ'য়ে বেজে ওঠে—আনন্দ হ'য়ে প্রকাশ পায়। বেহালার তারে ছড়ের আঘাত লাগে ; গানের সাগরে ঢেউগুলি জেগে ওঠে আর সেই কম্পিত ঢেউগুলির মাথায় মাথায় মানুষের ক্ষতবিক্ষত হিয়া ভেসে চ'লে যায় অনন্তের অতলস্নিগ্ধ অন্ধকারে যেখানে বাস্তবের কলরব গিয়ে পৌঁছায় না। এই সঙ্গীতের দ্বিতীয় জগত যদি না থাকতো, কোটী কোটী মানুষের কাছে সংসার হ'য়ে উঠ্‌তো সাহারার মরুভূমি। সুর সৃষ্টি করে মাটির কোলে স্বর্গ। কর্ত্তব্যের পিঞ্জর থেকে মুক্ত আমাদের শ্রান্ত মন বিহঙ্গের

মত ডানা মেলে সেই স্বর্গে আস্বাদন করে স্বাধীনতার অমৃত।

খেলার মতো, ধর্ম্মের মতো, সঙ্গীতের মতো সাহিত্যও বাস্তবের দুঃখ-আঘাতকে ভুলে থাকবার একটা প্রকাণ্ড উপায়। আমরা বই খুলে বসি আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন চলে যায় আর একটা জগতে। আমরা ভুলে যাই আমাদের দুঃখের আর নৈরাশ্যের কথা। সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটি অমৃতফলের মধ্যে কাব্যকে অন্যতম ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। সত্য সত্যই কবিরা কাব্যের অমৃতরস পান করিয়ে আমাদের ভুলিয়ে দেন বাস্তবের দুঃখ-বেদনাকে।

আর্টিষ্টরা একদিকে যেমন অন্যদের সুখী করে তাদের সম্মুখে রসলোকের তোরণ-দ্বারকে উদ্ঘাটিত ক'রে—তেমনি আর একদিকে নিজেরাও আপন সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পায় আনন্দের অমৃতকে। Too True To Be Good ব'লে বার্ণার্ড শ'য়ের একখানি নাটক আছে। এই নাটকের মধ্যে একজন মহিলা জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে বলছেন,

Fancy you wasting your time on painting pictures !

অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য—আপনি ছবি এঁকে আপনার সময় নষ্ট করবেন !

সৈন্যাধ্যক্ষ মহিলাটিকে উত্তর দিলেন,

Countess : I paint pictures to make me feel sane. Dealing with men and women makes me feel mad. Humanity always fails me : Nature never.

অর্থাৎ—কাউণ্টেস্, আমি যে ছবি আঁকি সে কেবল নিজের মাথাটাকে সুস্থ রাখবার জন্য। দো-পেয়ের সঙ্গে কারবার করতে করতে মনে হয় বুঝি ক্ষেপে গেলাম। মানুষের কাছে যখনই সান্ত্বনার জন্য গিয়েছি—ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসেছি। প্রকৃতির কাছে গিয়ে কখনো ব্যর্থমনোরথ হইনি।

যে কারণে সাধারণ লোকে নেশা করে দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্য—কতকটা সেই কারণে অনেক মানুষ ছবি আঁকে, গান গায়, কবিতা লেখে। মানুষের জগতে সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষকে আঘাত ক'রে সুখ পায়, হিংসা ক'রে আনন্দ অনুভব করে। তার পঙ্কিল হৃদয়ের পৈশাচিক প্রবৃত্তিগুলিই তো আজ অত্যুগ্র হয়ে পৃথিবীকে নরকের সামিল ক'রে তুলেছে! মানুষের জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যখনই আমরা প্রকৃতির পানে চাই তখনই দেখি—নীল নির্ম্মল আকাশ থেকে সহস্র ধারায় ঝরে পড়ছে সোনার আলো, নদীর তীরে তীরে ফুটে উঠেছে কাশের হাসি, মাঠে মাঠে কে যেন বিছিয়ে রেখেছে সবুজ ঘাসের সুকোমল গালিচা। আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়—মনও জুড়িয়ে যায়। তাই তো মানুষ যুগে যুগে বাস্তবের বেদনাকে ভুলবার জন্য প্রকৃতির পদপ্রান্তে নিয়েছে আশ্রয়! আকাশের নীলিমাকে রূপ দিয়েছে ছবিতে, নদীর কলধ্বনিকে ভাষা দিয়েছে সঙ্গীতে, পাহাড় আর প্রান্তর আর অরণ্যের সৌন্দর্য্যকে নিজের মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশিয়েছে আর তাকে রাঙিয়ে তুলেছে নতুন রঙে। মানুষের মনের পরশমণিকে ছুঁয়ে প্রকৃতি যখন আমাদের

হৃদয়-মুকুরে নতুন রূপে প্রতিভাত হয় তখন তার সেই রূপান্তর গ্রহণকে আমরা বলে থাকি আর্ট। সঙ্গীতের মতো, ধর্ম্মের মতো আর্টও আর্টিষ্টের কাছে দ্বিতীয় জগত। আর্টের শ্রান্তিহরা নীড়ে আশ্রয় নিয়ে আর্টিষ্ট ভুলে যায় মানুষের দেওয়া আঘাতকে আর অপমানকে।

যেমন কাল্পনিক স্বর্গের ছবি এঁকে, সুরের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে, আর্টের সুকোমল নীড়ে আশ্রয় নিয়ে মানুষ ভোলে তার ব্যর্থতার গ্লানিকে, ভোলে এই জগতের গগনচুম্বী বেদনার পাহাড়কে তেমনি দুঃখ ভুলবার জন্য মানুষ আরও অনেক কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষ টেনিস খেলে, ব্রিজ খেলে, গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখতে যায়—তার মূলেও দুঃখ ভোলার চেষ্টা। গরীব কেরাণী লটারীর টিকিট কিনে মনের মধ্যে তৈরী করে কল্পনার স্বর্গ-লোক। সেই কল্পলোকে তার ভাঙা স্যাঁতস্তেতে ঘরখানি রূপান্তরিত হয়েছে অট্টালিকায়—বিরাট প্রাসাদ ভরে গিয়েছে দাস-দাসীতে—কেরাণী-জীবনের দাসত্বের গ্লানির পরিবর্ত্তে হৃদয়কে অধিকার করেছে মুক্তজীবনের উচ্ছল আনন্দ! লটারির টিকিট দুর্ভাগা কেরাণীকে বাস্তবের রাহুগ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে মুক্তি দেয় কল্পনার রঙীন স্বর্গে।

থিয়েটারক্লাব, সাহিত্যক্লাব, আরও অনেক রকমের ক্লাব—এগুলিও কি অনেকের পক্ষে প্রাণ জুড়াবার দ্বিতীয় জগত নয়? বাড়ীতে স্ত্রীর অনুক্ষণ শাসন। হুকুমের পর হুকুমের, অনুযোগের পর অনুযোগের বিরাম নেই! বেচারী স্বামী

কণ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে চলে আসে ক্লাবে আর সেখানে মনের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দেয় ভাষায়। বাড়ীতে স্ত্রীর ভয়ে যে সব কথা চেপে রাখতে হয়—ক্লাবে এসে সেই সব কথা যুক্তি দিয়ে সে প্রতিপন্ন করে। Dr Stekel একটা বড়ো সত্যি কথা লিখেছেন,

For many thousands the club is nothing more than an opportunity to work off their energies, to get rid of unused emotions and to play that role which life in the first sphere has denied them.

এমনি ক'রে আমরা যখন সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকটী মানুষেরই একটা ক'রে দ্বিতীয় জগত আছে যাকে Dr Stekel বলেছেন second world. যাদের আমরা মনে করি অত্যন্ত সুখী, খ্যাতির এবং সম্পদের উচ্চতম শিখরে সমাসীন, তাদের পক্ষেও প্রয়োজন আছে দ্বিতীয় একটা জগতে আশ্রয় নেবার। সুখ যত তীব্রই হোক, তাকে দীর্ঘকাল ধ'রে ভোগ করতে গেলেই আমাদের নিরাশ হ'তে হবে। সুখের তীব্র অনুভূতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—কিছুক্ষণ পরে আনন্দের অনুভূতি ম্লান হ'য়ে আসে। Dr Stekel বলছেন, Happiness is like the possession of a beautiful wife. সুখ সুন্দরী স্ত্রীর মত। যতক্ষণ তাকে না পাই ততক্ষণ সর্ব্বদার জন্য হারাই হারাই ভয়। কৃপণের ধনের মতো তাকে আমরা চোখে চোখে রাখি। তারপর বহু

আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী কখন একদিন বধূ হ'য়ে আসে। তখন থেকে আর সে সমস্ত চেতনাকে জুড়ে থাকে না। সহসা যদি কখনো তাকে হারানোর আশঙ্কা জেগে ওঠে প্রাণে তখন, কিন্তু, আমরা শিউরে উঠি। সুখকে নিরন্তর ভোগ করতে করতে সুখের মর্য্যাদাকেও আমরা ভুলে যাই। সুখ যখন চ'লে যায় তখন আমরা হারানো দিনের জন্য হায়! হায়! করি। জীবনকে আমরা যত রকমের মিথ্যা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছি, সুখ হ'চ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রকাণ্ড মিথ্যা।

দাম্পত্য জীবনের সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে আমাদের দ্বিতীয় জগতের উপরে। স্বামী যেখানে সারাদিনের ক্লান্তির পরে সঙ্গীতের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়েছে সেখানে স্ত্রী যদি নিয়ে আসে ঘর-সংসারের তুচ্ছ কথা—তবে দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হ'তে বাধ্য। আর্টের রসলোক যেখানে পুরুষের একার, সেখানে নারীর প্রতি তার টান তেমন নিবিড় থাকতে পারে না। আর্ট পুরুষ-হৃদয়ের উপরে যতই আপনার আধিপত্য বিস্তার করে, নারী ততই পুরুষের হৃদয়-রাজ্যের উপরে আপনার অধিকারকে হারিয়ে ফেলে। এই জন্যই নারীর পক্ষে বুদ্ধিমতীর কাজ হচ্ছে—আর্টের রসলোকেও পুরুষের সহচরী হওয়া। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে নারী আর পুরুষকে যে বন্ধনে বেঁধে দেয় সে বন্ধনের চেয়েও দৃঢ়তর বন্ধন আছে আর তা হ'চ্ছে দ্বিতীয় জগতের বন্ধন যেখানে নারী কেবল পুরুষের শয্যার সঙ্গিনী নয়—তার রসলোকে বিচরণ করবারও সহযাত্রী।

এই যে কল্পনার জগত আমরা তৈরী করি বাস্তবের দুঃখকে ভুলবার জন্য—এই কল্পনার জগতই হ'চ্ছে পাগলের জগত। পাগল ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হ'য়েও নিজেকে রাজা ভাবে, কাঠের আসনকে মনে করে স্বর্ণখচিত সিংহাসন। আমরাও যখন কল্পনার জগতে বিচরণ করি—তখন কিছুক্ষণের জন্য পাগলের সামিল হ'য়ে যাই। পাগলের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে কল্পনার জগত থেকে বাস্তবের জগতে অবতীর্ণ হ'ওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। সেই ক্ষমতার বলে দিবাস্বপ্নের ইন্দ্রলোক থেকে আমরা নেমে আসি আমাদের কর্ত্তব্যের জগতে। পাগল তার কল্পনার জগতকে কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

মানুষের এই দ্বিতীয় জগতকে না জানলে তাকে ঠিক মতো জানা যায় না। তার কল্পনার জগতকে আমরা যখন জানি তখনই তাকে আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারি, তখন আমরা জানি বড়ো মানুষের দুর্ব্বলতার রহস্য এবং সাধারণ মানুষের শক্তির উৎস কোথায়।

অতীতের প্রেতাত্মা

We look before and after,
And pine for what is not :

অতীতের অল্পবিস্তর ক্রীতদাস আমরা সবাই। শৈশবকে আমরা ভুলতে পারি কৈ? স্বপ্নভরা সোনার শৈশব! সেখানে সারাবেলা ধরে বাজে কেবল মন-ভোলানো বাঁশি। দায়িত্বের বোঝা নেই কাঁধে। নেই নৈরাশ্যের বেদনা, নেই পরাজয়ের গ্লানি। নেই দ্বারে দ্বারে চাকুরি খোঁজার বিড়ম্বনা, নেই কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা। নেই উদ্দাম প্রবৃত্তির কষাঘাত, নেই পশ্চাত্তাপের অসহনীয় বৃশ্চিক দংশন। প্রভাতের সুস্নিগ্ধ রৌদ্রালোকে জীবনের তরণীখানি নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষের উপর দিয়ে তরতর ক'রে ব'য়ে চলেছে। পৃথিবী পটে-আঁকা ছবির মতোই সুন্দর। দিনগুলি কবিতার এক একটি চরণের মতোই মনোহর। ঠাকুরমার মুখে রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প শুনতে শুনতে ঘুম আসে চোখে। সে ঘুম যখন ভেঙে যায়, তখন শয়ন-শিয়রে জেগে আছে জননীর হাসিভরা নত মুখখানি। সামনে প'ড়ে আছে সহচরগণের কলহাস্যে মুখরিত সুধায় ভরা দীর্ঘ দিন। বাগানে বাগানে জামরুল আর পেয়ারা আর কাঁচামিঠে আম খাওয়ার মধুর মধ্যাহ্ন। নতুন কাপড়, নতুন জামা আর নতুন জুতো প'রে সঙ্গীদের সঙ্গে

পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখে বেড়ানোর শিশিরস্নিগ্ধ শারদ প্রভাত। বিলের ধারে সবুজ মাঠে বল খেলার সোনালি অপরাহ্ণ।

তারপর একদিন ফুরিয়ে যায় মার্ব্বেল খেলা আর লাট্টু ঘোরানোর দিন. মায়ের মুখ থেকে রূপকথার কাহিনী শোনার সন্ধ্যা, ঠাকুরমার কোলের কাছটিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে থাকার রাত্রি। যৌবনের মধ্যাহ্ন আসে কণ্ঠে নিয়ে বাস্তবের প্রচণ্ড আহ্বান। আসে আঘাত, আসে অপমান, আসে অবসাদ। সুরু হয় দারিদ্র্যের কণ্টকাকীর্ণ পথে কেরাণীর অভিশপ্ত জীবন-যাত্রা। আশার দীপগুলি একে একে যায় নিবে। বৈচিত্র্যহীন কর্ম্মক্লান্ত দিনগুলি ভ'রে ওঠে নিরাশার অন্ধকারে। বর্ত্তমান দেখা দেয় নিষ্ঠুর কদর্য্য মূর্ত্তি নিয়ে!

অনেক মানুষই নির্ম্মম বাস্তবের এই কঠিন মূর্ত্তির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে পড়ে। বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই ক'রে সুমুখের পানে এগিয়ে চলবার সাহস ত সকলের থাকে না! বর্ত্তমান যখন দুঃসহ হয়ে ওঠে, ভবিষ্যতের কাছ থেকে আশা করবার আর কিছুই থাকে না যখন—তখন অবসন্ন ক্ষত-বিক্ষত জীবন বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অতীতের কোলে নেয় আশ্রয়! শৈশবের সুখময় নীড়ে ফিরে যাবার স্বপ্নে মন হয় মস্‌গুল! ধাক্কার পর ধাক্কা এসে অন্তরকে যত বেশী বিচলিত করে, আমাদের ক্ষুব্ধ চিত্তে শৈশবের স্মৃতি তত বেশী মনোহর হ'য়ে দেখা দেয়। যা নেই তার জন্য আমাদের সমস্ত সত্তা কেঁদে ওঠে হায় হায় ক'রে! এমনি

ক'রে অতীতের স্বপ্ন যাদের মনকে পেয়ে বসে, জীবনের হাটে তারা হ'য়ে যায় অকর্ম্মণ্য! তারা শুধু বিগত দিনের পানে মুখ ফিরিয়ে অশ্রুমোচন করে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে! এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ত সেই সব মেরুদণ্ডহীন স্বপ্ন-বিলাসীদের জন্য নয়, যারা নিজেদের ছিনিয়ে নিতে পারে না অতীতের সুকোমল ভুজ-বন্ধন থেকে! জীবনে কেবল আনন্দই পেয়ে যাবো, দুঃখ পাবো না—এ কেমন কথা? সুখ-দুঃখ নিয়েই তো জীবন! এখানে কাঁটার সঙ্গে ফুল আর ফণার সঙ্গে মণি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু অমৃতটুকু নেবো, বিষটুকু নেবো না—মিলনের সুখটুকু পাবো, বিচ্ছেদের ছায়াটুকুও মাড়াব না—খ্যাতির মাল্য কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াবো, নিন্দার শরজালকে ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দেবো না—এ নিয়ম আমাদের এই জোয়ার-ভাঁটার, আলো-ছায়ার পৃথিবীর নয়। তারা বুড়ো হ'য়েও খোকার পর্য্যায়ে পড়ে যারা পৃথিবীতে কেবল আনন্দের কাঙাল, যারা বাস্তবের কঠিনতার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অতি সহজে মুষড়ে পড়ে, জীবনের আহ্বানে যারা কিছুতেই সাড়া দেয় না এবং স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরী যে দিনগুলি অতীতের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাদেরই পানে চেয়ে চেয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে! আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অতীতের জন্য একটা সুকোমল স্থান আছে। দিনের শেষে নিদ্রাদেবী এসে যখন আমাদের তুলে নেয় তার শীতল অঙ্কে, তখন আমরা রাতের স্বপ্নকে আশ্রয় ক'রে পিছনে-ফেলে-আসা আমাদের অতীতের রঙ-মহল আর শীষমহলগুলিতে সাধ মিটিয়ে ঘুরে বেড়াই।

দিন আসে, কর্ত্তব্যের শঙ্খ-গর্জ্জন সুরু হয়, আমরাও আমাদের স্বপ্নের রঙমহলের আর শীষমহলের দ্বারগুলিতে তালাচাবি লাগিয়ে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু এমন মানুষও সংসারে যথেষ্ট আছে, যারা অতীতের স্বপ্নপুরী থেকে কিছুতেই নিজেদের ছিনিয়ে আনতে পারে না, যারা বর্ত্তমানের প্রচণ্ড কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও সারাবেলা ধরে শোনে কেবল অতীতের কলকণ্ঠ। এদের বয়স হয় না কোনদিনই—বাস্তব এদের মনের মধ্যে জাগাতে পারে না কোনো সাড়া—এরা চিরকালের খোকা—কোন্‌কালে ঘি খেয়েছে তারই গন্ধ শুঁকে শুঁকে দিনের পর দিন করে কাবার—সত্যযুগের আর রামরাজত্বের গুণগানে এরা পঞ্চমুখ—ঝরাফুলের পাঁপড়ি দিয়ে গাঁথে মালার পর মালা। এই মেরুদণ্ডহীন, স্বপ্নবিলাসী, কর্ম্মবিমুখ, হতভাগ্য জীবগণের সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে Dr Stekel লিখেছেন, They are chasing butterflies in cemeteries. ছিন্নভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের সমাধিভূমিতে এরা কেবল সুখের প্রজাপতির পিছনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! Dr Stekel সাবধান ক'রে দিয়েছেন সেই সব জনক-জননীকে যারা ছেলে-মেয়ের শৈশবকে সর্ব্বপ্রকারের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত রাখবার জন্য অতিমাত্রায় সজাগ। One must be careful that it is not made too beautiful. ছেলেবেলার বেদনাহীন স্বর্গের পারিজাতবনে খেলা ক'রে ক'রে তো আর সারা জীবন কাটবে না! শৈশবের স্নিগ্ধ প্রভাত কখন একদিন মিলিয়ে

যাবে যৌবনের মধ্যাহ্নে! স্বপ্ন ভেঙে যাবে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে! আসবে দারিদ্র্য, আসবে অবহেলা, আসবে জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকবার জন্য ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির অসহনীয় বিড়ম্বনা। শৈশব যাদের কেটে যায় অতিরিক্ত আরামের মধ্যে—যৌবনের দুঃখ-আঘাত তাদের পক্ষে হ'য়ে পড়ে একান্ত দুঃসহ। সেই দুঃসহ বেদনার মধ্যে প্রাণে জাগে হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলির জন্য একটা দুর্নিবার পিপাসা। সেই পিপাসার নিবৃত্তি হয় কেবল স্বপ্ন দেখার মধ্যে। শৈশবের সোনালি প্রভাতের স্বপ্ন দেখা! যে প্রভাত চলে গেছে, তা আর কোন দিন ফিরে আসে না। লাভের মধ্যে জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে যায় কেবল অলস স্বপ্নের রঙ-বেরঙের জাল বুনে বুনে। বাস্তবের আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরে যায় বারে বারে! বুড়ো-খোকা স্বপ্নলোক থেকে কোনদিন জেগে ওঠে না সংসারের কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে!

কিন্তু অতীত আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করে দেয় কেবল কি সুখের বাঁশী বাজিয়ে? তার দুঃখের স্মৃতিগুলিও কি আমাদের সম্মুখের চলার পথে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে না? Woe to him who looks back into the dangerous moments of his life! কোথায় আছে সেই মানুষ যে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারে—কোনো পাপ করিনি, কোনো ভুল হয়নি এই জীবনে? নৈরাশ্যের বেদনাকে অনুভব করিনি একটি দিনের জন্যও? এমন মানুষ কখনো জন্মায়নি এই পৃথিবীতে—কোনোদিন জন্মাবে ব'লেও বিশ্বাস

করিনে! টলষ্টয়ের আত্মচরিত পড়েছি—গ্যেটেরও আত্মচরিত পড়েছি—আরও অনেক অনেক প্রতিভাবান পুরুষের আত্মচরিতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এমন জীবন তো দেখলাম না যার আগাগোড়া সবটাই প্রভাতের পুষ্পের মত নিষ্কলঙ্ক। সব জীবনেই মিশিয়ে আছে অষ্টারলিজের জয়ের আনন্দের সঙ্গে ওয়াটারলুর পরাজয়ের বেদনা।

তবে একটা কথা! আমাদের সকলের অতীতই ভুল-ভ্রান্তিতে প'রিপূর্ণ হ'লেও সেই ভুল-ভ্রান্তির স্মৃতি কারও কারও জীবনের উপর এমন সুগভীর রেখাপাত করে যে, সামনে চলবার উৎসাহ তারা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে। সেই স্মৃতিকে কিছুতেই তারা মুছে ফেলতে পারে না জীবনের পাতা থেকে! ইনসিওরেন্সের দালাল যেমন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়তে চায় না, তাদের অতীতও তেমনি কিছুতেই তাদের জীবনের রঙ্গভূমি থেকে অদৃশ্য হ'তে চায় না। মহাদেব যেমন সতীর মৃতদেহকে কাঁধে ক'রে বেড়িয়েছিলেন উন্মত্তের মত দিকে দিকে—তেমনি তারাও আপন আপন অতীতের বোঝাকে মনের উপরে বহন ক'রে বেড়ায় নিশি-দিন। তাদের মনে যেন মাখানো থাকে শিরিসের আঠা, জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার স্মৃতি কিছুতেই সেই মন থেকে স্খলিত হ'তে চায় না। কবে কোন লোক কি অপমানের কথা বলেছিল, কে কি রকম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কবে চেয়েছিল—সমস্ত ঘটনার স্মৃতি তাদের চেতনায় জমা হ'য়ে থাকে, কিছুতেই সেই সব স্মৃতিকে ভুলতে পারে না তারা। ভুলতে পারে না ব'লেই প্রতিহিংসার

অনল রাবণের চিতার মত তাদের চিত্তে ধ্বক্‌ধ্বক্‌ ক'রে জ্বলতে থাকে। ক্ষমা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

এই রকমের মন যাদের—মনোবিজ্ঞান তাদের বলে নিউরটিক। নিউরটিকদের (Neurotic) রুগ্ন মনের সঙ্গে সুস্থ মনের পার্থক্য হ'চ্ছে—যারা সবল চিত্তের অধিকারী, তারা অতীত জীবনের ব্যর্থতার বোঝাকে সুদূরে নিক্ষেপ ক'রে নবোদ্যমে লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হয়। যাদের মন অসুস্থ, তারা অতীত-জীবনের বিফলতার বোঝা থেকে স্মৃতিকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারে না। জীবনের পথে যত তারা অগ্রসর হয়—ব্যর্থতার স্মৃতি জগদ্দল পাথরের মত তত বেশী ভারী হ'য়ে তাদের মনের উপরে চেপে বসে। মনের স্বাস্থ্য যাদের অক্ষুণ্ণ তারাও বিফলতার গ্লানিকে অনুভব করে—ব্যর্থতাকে এড়াতে পারে কে? তারাও চলতে চলতে বারে বারে পড়ে কিন্তু হাল তারা কখনও ছেড়ে দেয় না। শত-চ্ছিন্ন আশার পতাকাকে পুনরায় তুলে ধ'রে নবোৎসাহে তারা এগিয়ে চলে সংকল্পকে বাস্তবের মধ্যে রূপ দিতে। নিউরটিক একবার বিফল হ'লে আশা-ভরসা সব হারিয়ে ফেলে। সে যে সফল হ'তে পারে নি, পরাজিত হয়েছে—এই চিন্তা কাছিমের মত কামড়ে থাকে তার মনকে, তাকে লক্ষ্যের পানে কিছুতেই অগ্রসর হতে দেয় না।

The neurotic does not get done with his past. চলতে চলতে একবার যদি তার পদস্খলন হয়, চক্ষু স্থির! আমি পাপী, আমি পাপী—এই কথাই অহরহ জেগে

থাক্‌বে তার মনে! উঠ্‌তে, বসতে, নাইতে, খেতে, শুতে—সব সময় কেবল একই চিন্তা, আমি পাপ করেছি, আমি পাপ করেছি। নিউরটিক চুল ছিঁড়বে, 'কি করলাম' 'কি করলাম' ব'লে রাত জেগে চোখের জলে বালিস ভেজাবে, নিজের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তকে একান্ত বড় ক'রে দেখে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট ক'রে দেবে।

মানুষের মধ্যে যারা বড়ো—তাদের বিশিষ্টতা কোথায়? তাদের বিশিষ্টতা হ'চ্ছে হতাশাময় অতীতকে জয় করার শক্তির মধ্যে। অতীতের পরাজয়কে বড় ক'রে দেখেনি তারা। পরাজয়ের স্মৃতিকে দূরে ঠেলে ফেলে পুনরায় তারা কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে—অন্তরে যে সন্দেহ প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই সন্দেহকে জয় করেছে। গান্ধী কোন্‌খানে বড়ো? চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ড তাঁকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে, জনসাধারণকে নিয়ে কাজ করার বিপদ কোথায়—সে কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সে তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষাদময়ী স্মৃতি তাঁর উদ্যমকে শিথিল এবং বিশ্বাসকে ম্লান করতে পারে নি। বার্দ্দোলির পরাজয়কে যদি তিনি একান্ত বড়ো ক'রে দেখতেন, তবে ১৯৩০ সালে আশীজন মাত্র অনুচর নিয়ে লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোতো না। বিফলতার স্মৃতিকে একান্ত বড় ক'রে দেখলে ডাণ্ডি যাত্রার পূর্ব্বে চৌরিচৌরার কথাটা তাঁর মনে পুন পুন জাগতো—তিনি এক পা আগিয়ে দশ পা পিছিয়ে যেতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত লবণ-সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প ছেড়ে দিতেন। গান্ধীর নেতৃত্ব কোন্ দিন ফুরিয়ে যেতো! সে নেতৃত্ব যে

আজও ফুরিয়ে যায় নি, তার কারণ, পরাজয়ের পর পরাজয় তাঁর আশাকে ম্লান করতে পারে নি, ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর সামনে চলার সঙ্কল্প শিথিল হয় নি। বিফলতার পর বিফলতার গর্ভ থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন—রাহুগ্রাসমুক্ত সূর্য্যের মত নূতন গরিমা নিয়ে। Dr Stekel লিখেছেন,

True greatness, however, shows itself in being able to act in spite of one's experiences in overcoming latent distrust.

স্নায়ু যাদের দুর্ব্বল, তারাই বড়ো ক'রে দেখে আপন জীবনের অতীতের অভিজ্ঞতাকে। নূতন কাজে যখন তারা হাত দিতে যায়, তারা ভাবতে আরম্ভ করে তাদের পুরাতন দিনের ব্যর্থতার কথাকে। সংশয়-দোলায় মন তাদের দুলে দুলে ওঠে, লাভ-লোকসানের কথা শতবার ক'রে তারা ভাবে, ঘড়ির দোলকের মত তাদের মন 'করবো, কি করবো না' —এই উভয় ভাবনার মধ্যে ক্রমাগত দোল খেতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়—কিছুই তারা করে না। অজানার গর্ভে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দেবার সাহস নেই যাদের, তারা দুনিয়ায় কোন্ বড় কাজ করবে? অতীতের ব্রহ্মদৈত্য যাদের ইচ্ছাশক্তিকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে, তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করা বাতুলতা।

বাস্তব যখন হৃদয়ের দ্বারদেশে আঘাত দিচ্ছে তার প্রচণ্ড দাবী নিয়ে, তখন যারা অতীত-দিনের সুখ এবং অতীত-দিনের দুঃখ দিয়ে পূর্ণ করে তাদের বর্ত্তমানের পাত্রখানি, তারা শুধু

জীবনকে ব্যর্থ করে। যে সুখের দিন চলে গেছে, তার জন্য কান্না কেন? যে দুঃখের দিন অতীত হয়ে গেছে তার ব্যর্থতা নিয়ে, তাকেই বা টেনে এনে কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করার বিড়ম্বনা কেন?

হতাশ হবার কিছু নেই! যে মনে করে জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, তারই জীবন ব্যর্থ হয়! অতীতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কর আপনার জীবনকে! আঘাতের স্মৃতিকে মনের মধ্যে পুষে রেখে লাভ নেই। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না! ভুলে যাও যে দুঃখ, যে অপমান পেয়েছো তার স্মৃতিকে! ভুলে যাও, ক্ষমা কর! জগতে দুঃখের কি সীমা আছে? সেই অসীম দুঃখের কাছে নিজের পরাজয় আর ব্যর্থতার দুঃখ কতটুকু! তাকে অতিক্রম করেই জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর হতে হবে।

আদর্শের অত্যাচার

এই দুনিয়াটা একটা প্রকাণ্ড পাগলা-গারদ আর আমরা সবাই এক-একটি পাগল—রঁাচির পাগল নয়, ভাবের পাগল। নিজের নিজের ভাবে আমরা সবাই বিভোর হ'য়ে আছি। We all suffer from a false and subjective valuation of our ideas. We all drag overvalued ideas about with us. প্রত্যেকেই মনে করে, সত্যকে সে-ই পেয়েছে—বাকী সবাই ভ্রান্তির অন্ধকারে বিচরণ করছে। কিন্তু এই যে আমরা মনে করি—জ্ঞান আমাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি এবং বাকী সবাই মূর্খ—এই মনে করার মধ্যে আমাদের অহমিকার উৎকট প্রকাশই কি আমরা দেখতে পাইনে? অন্ধের হাতী দেখার মতোই কি আমাদের ধারণাগুলি একদেশদর্শিতার কালিমায় কলঙ্কিত নয়?

আমরা সংসারের যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই, এক-একজন ভাবের পাণ্ডা এক-একটি আদর্শের প্রতিমা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে আর যাত্রীদের বলছে, "ওগো এসো, আমার ঠাকুরের পায়ে নিঃশেষে নিবেদন কর তোমার কুসুম-অর্ঘ্য।" কোনো পাণ্ডা হাঁকছে, 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে ;—আবার কোনো পাণ্ডার কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে—জ্ঞানের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। কেউ বলছে, জগৎ

মায়া—আবার কেউ বলছে, রূপের মধ্যে অরূপেরই লীলা, সীমার মধ্যে অসীমেরই সুর, অনিত্যের মধ্যে নিত্যেরই প্রকাশ। কারও কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে, নারী দিনে মোহিনী এবং রাতে বাঘিনী ; অতএব দূর কর নারী-মায়া ; কারও বা কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে, A man is a great thing upon the earth and through eternity, but every jot of the greatness of man is unfolded out of woman ; বার্ণার্ড শ' মেয়েদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, মেটার্লিঙ্ক তা করেন না ; শোপেনহয়ার নারী সম্পর্কে যা লিখেছেন, হুইটম্যান লিখেছেন তার উল্টো। এক মুনির মতের সঙ্গে আর এক মুনির মতের মিল নেই। একজন বলছে, প্রতিমা পূজা করিও না—ভগবান নিরাকার ; অপরজন বলছে, নিরাকার ভগবানকে আমরা ভাবতে পারিনে ; ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির পক্ষে মূর্ত্তিপূজাই প্রশস্ত। বিজ্ঞানের গুণকীর্ত্তনে কেউ পঞ্চমুখ ; আবার কারও মতে বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যের একটা দিক মাত্র আমরা জানতে পারি—যাকে মাপা যায়, গোণা যায়। গভীরতর সত্য—যা কেবল অনুভূতির বিষয়, তাকে জানতে হ'লে চাই বিশ্বাসের জ্যোতি। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধ'রে চলে আসছে। বায়োলজির ক্ষেত্রেও মতের সঙ্গে মতের কি নিদারুণ সংগ্রাম! একদল পণ্ডিত বলছেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরী করতে হ'লে জোর দিতে হবে সুপ্রজননের উপরে, রক্তের কৌলীন্যই হোলো আসল বস্তু। আর একদল পণ্ডিত বলছেন, শিক্ষা-দীক্ষার উপরেই

মানুষের ভালোমন্দ নির্ভর করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি আত্মপ্রকাশের পক্ষে অনুকূল হয়, মানুষ ভালো হ'তে বাধ্য। কারও কণ্ঠে কুটীর-শিল্পের জয়গান—কারও কণ্ঠে বা যন্ত্র-শিল্পের মহিমাকীর্ত্তন। কেউ দিচ্ছে গণতন্ত্রের (democracy) পায়ে হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা, আবার কেউ বলছে—একনায়কত্ব (dictatorship) ছাড়া জাতির মঙ্গল সম্ভব নয়। কেউ বলছে, বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের শেখাও হাতের কাজ; কেউ বলছে, vocational trainingএর উপর এত জোর দিতে গিয়ে আমরা ছেলে-মেয়েদের এক-একটি যন্ত্র ক'রে তুলবো। কেউ বলছে, ব্রহ্মচর্য্যই মানুষকে উন্নত করে; নারী-পুরুষের মধ্যে একটিমাত্র সম্পর্ক হওয়া উচিত আর সেই সম্পর্ক হচ্ছে ভাই-বোনের সম্পর্ক। আর একদল বলছেন, সংযমের দোহাই দিয়ে ছেলে-মেয়েদের যৌন-জীবনকে নিষ্পেষিত করবার ফল কখনও শুভ হয় না; অবদমন (repression) মানসিক স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে। কেউ বলছে, খৃষ্টান ধর্ম্মই একমাত্র সত্য—খৃষ্টের শরণ লওয়া ব্যতীত আত্মার মঙ্গল নেই; অপর দল খৃষ্টধর্ম্মের নাম শুনলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠেন। শাক্ত বৈষ্ণবের উপর খড়্গহস্ত; বৈষ্ণব কৃষ্ণের হাতে বাঁশী ছাড়া আর কিছু দেখতে অক্ষম। উদারপন্থীর দল মনে করেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলকে একেবারে ছেঁড়া অসম্ভব; তাকে ক্রমশ ছিঁড়তে হবে; চরমপন্থীর দল মনে করেন, স্বাধীনতার অভিধানে ক্রমশ বলে কোনো শব্দ নেই; বিপ্লব ছাড়া মুক্তিলাভ অসম্ভব। কারও মতে সশস্ত্র বিপ্লব স্বাধীনতালাভের একমাত্র রাস্তা;

কেউ বা ব'লে থাকেন—রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে মুক্তিলাভ করতে হ'লে বহু শতাব্দী লেগে যাবে—নিরুপদ্রব আইন-অমান্য-আন্দোলনই একমাত্র পথ যা আমাদের অনতিকালের মধ্যে পৌঁছে দেবে মুক্তির অভ্রভেদী মন্দির-দ্বারে। কেউ বলছে, সত্য রয়েছে পাশ্চাত্যের সাধনায় ; কেউ বলছে, মানব-জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করবে প্রাচ্যের তপস্যা। কেউ বলছেন, আমাদের কল্যাণ রয়েছে নাগরিক সভ্যতার বিস্তারের মধ্যে ; কেউ বা বলছেন, ফিরে চল্ মাটির পানে ; ভেঙে ফেল যন্ত্র-সভ্যতার জতু-গৃহ, পল্লীর ছায়া-শীতল বুকে সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের মধ্যে আমাদের যথার্থ মঙ্গল।

আদর্শের সঙ্গে আদর্শের এই যে লড়াই, আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার এই যে সংগ্রাম—এ সংগ্রাম বহুকালের। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমাদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্ত অনেক সময়ে গন্তব্য পথের রেখা খুঁজে পায় না। আমাদের অবস্থা হ'য়ে ওঠে প্রাচীনকালের স্বয়ম্বর সভার রাজকন্যাদের মতো। সমাগত রাজপুত্রগণের মধ্যে কার গলায় মাল্যদান করবেন—তা ঠিক করা অনেক সময়েই রাজনন্দিনীদের পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠ্তো। বহু আদর্শের মধ্যে কোন্ আদর্শের গলায় বরণমাল্য পরিয়ে দেবো—তা স্থির করা আমাদের পক্ষেও অনেক সময়ে কঠিন হ'য়ে ওঠে। স্বাধীনতালাভের পক্ষে গান্ধীর পথ প্রশস্ত, না লেনিনের পথ প্রশস্ত? ধর্ম্ম কি সত্য সত্যই বিপ্লবের পথে অন্তরায়? বিবাহিত জীবন বিপ্লবীর কর্ম্মোন্মাদনাকে কি পঙ্গু করে? এমনি সব প্রশ্নের সম্মুখে দিশাহারা পথিকের

মতোই আমাদের অবস্থা হয় ন যযৌ ন তস্থৌ। 'ভবে সত্য মিথ্যা কে ক'রেছে ভাগ, কে রেখেছে মত আঁটিয়া ?'—এই প্রচণ্ড সত্যের সামনে আমাদের আবাল্যসঞ্চিত ধারণাগুলি কেমন অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে আর অন্ধকারে ঘুম-থেকে-জেগে-ওঠা শিশু যেমন ক'রে কাঁদে তেমনি ক'রে আমাদের অসহায় চিত্ত আলোর জন্য কাঁদতে থাকে।

কিন্তু আদর্শের সঙ্গে আদর্শের এই যে সংগ্রাম—এই সংগ্রামকে এতখানি নির্ম্মম ক'রে তুলবার সত্যই কি কোনো কারণ আছে ? চৌমাথায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে যারা নিজের ধর্ম্মের গুণগান করে এবং অন্য ধর্ম্মকে গালাগালি দেয় তারা কি মূর্খ নয় ? নিজের আইডিয়াকে অত্যন্ত বড়ো ক'রে দেখতে গিয়ে যারা অপরের আইডিয়াকে গণনার মধ্যে আনে না, তাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাই কি আজ জগতকে পাগলা-গারদে পরিণত করেনি ? ইটালির লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দেশপ্রীতির উৎকট আধিপত্যই আবিসিনিয়ার শিরে সর্ব্বনাশকে ডেকে আনলো। দেশপ্রীতির আদর্শের মতো জাগতিক প্রীতির আদর্শও যে বরণীয়—এ সত্য আজ ম্লান হয়ে গেছে জার্ম্মানীতে, ইটালিতে, জাপানে। মরুক চীন—কিন্তু জাপান বড়ো হয়ে উঠুক। বিলুপ্ত হ'য়ে যাক আবিসিনিয়ার স্বাতন্ত্র্য কিন্তু ইটালির শ্রীবৃদ্ধি হোক। চেকোশ্লোভেকিয়ার চিতাভস্মের উপরে সগর্ব্বে তুলুক নব্য-জার্ম্মানীর জয়-ধ্বজা। এই দুরন্ত patriotismই আজ পৃথিবীর আকাশে ধূমকেতুর মতো দেখা দিয়েছে। দেশাত্মবোধের যে আদর্শ—তার নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড

একটা মূল্য আছে। মুস্কিল হয় তখনই, যখন সে আমাদের হৃদয়ের সবটুকু প্রীতি দখল করবার জন্য দস্যুর মতো বাড়িয়ে দেয় তার রোমশ উদ্ধত হাত দু'খানি। ইটালিতে, জার্ম্মানীতে, জাপানে মানুষকে ক্রমাগত শেখানো হয়েছে—দেশপ্রীতিই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য অন্য দেশকে লুণ্ঠন করার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। একটা আদর্শের উপরে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে জাতিগুলো হ'য়ে উঠেছে রক্তপাগল ডালকুত্তার মতোই হিংস্র।

দেশপ্রীতির আদর্শ জনসাধারণের কাছ থেকে অযথা সম্মানলাভ করলে যেমন সর্ব্বনাশ ঘটতে পারে, তেমনি স্বজন-প্রীতির অথবা সার্ব্বলৌকিক প্রীতির আদর্শ দেশপ্রেমের আদর্শকে খর্ব্ব ক'রে একান্ত বড়ো হ'য়ে উঠলেও সর্ব্বনাশ ঘটে থাকে। দেশপ্রীতির আদর্শকে ম্লান ক'রে স্বজনপ্রীতির আদর্শ আমাদের চিত্তকে একদিন একান্তভাবে অধিকার করেছিলো বলেই আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম। বিদেশী রাজা আমাদের দেশকে আক্রমণ করেছে—আমরা জাতি হিসাবে সে আক্রমণকে বাধা দিই নি; দেশের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হই নি। আমাদের সত্তা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে ছিলো আমাদেরই ঘরের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। আমরা মাঠে হলকর্ষণ করেছি, দেবতার মন্দিরে মহাদেবের মাথায় ফুলবিল্বপত্র চাপিয়েছি, ঘরে এসে সন্তানকে কোলে তুলে নিয়েছি আর গৃহকার্য্যে আমাদের মনকে নিমগ্ন রেখেছি। দেশ বিদেশীর হাতে গেল—তা নিয়ে মাথা ঘামানো কোনোদিনই প্রয়োজন

মনে করিনি। ঘরকে যতখানি মূল্য দেওয়া উচিত তার চেয়ে মূল্য দিয়েছি ঢের বেশী, আর তার ফলেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ। একদিকে যেমন ঘরকে প্রয়োজনকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছি, তেমনি আর একদিকে বিশ্বপ্রেমকেও অতিরিক্ত মূল্যদান করেছি। বিশ্বপ্রেমের আতিশয্যে অতিমাত্রায় উদার হ'তে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম, Charity begins at home. বসুধাকে কুটুম্ব মনে করেছি কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশীর গ্রাস থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করিনি। এই জন্যই বঙ্কিম লিখলেন,

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিলো। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে।

বঙ্কিম দেশপ্রীতিকে বললেন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম—কারণ যে আদর্শকে অবনত ক'রে আমাদের জাতীয় জীবনে সর্ব্বনাশ ঘটলো তাকে এতখানি সম্মান না দিলে আমাদের নবজীবনলাভের কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না।

এত কথা বলবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তবুও যে লেখা হোলো, তার কারণ, সামঞ্জস্যের অভাবই আমাদের জীবনে অমঙ্গলকে ডেকে আনে আর এই সামঞ্জস্যের অভাব যে ঘটে—তার কারণ, কোনো একটা ভাবের প্রতি আমাদের অত্যধিক মোহ। জীবন-বীণার কোনো একটা তারের সুর যখন অন্যান্য তারের সুরগুলিকে ডুবিয়ে দিয়ে অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে বাজতে থাকে, তখনই আমাদের চলার মধ্যে আর কোনো

ছন্দ থাকে না। এক-একটা আইডিয়া আমাদের চিত্তের ষোল আনা যে এমন ক'রে জুড়ে বসে, তার কারণ আছে। সব চিন্তা আমাদের মনের উপরে সমান রেখাপাত করে না। অধিকাংশ চিন্তাই ছায়ার মতো এসে আবার ছায়ার মতোই দিগন্তে মিলিয়ে যায়। কিন্তু দু'একটা ভাব এমন ক'রেই আমাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে যে তাদের আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি নে। জীবনের তারে তারা যে কম্পন জাগায়—শেষদিন পর্য্যন্ত সে কাঁপনের অবসান হয় না। যে সমস্ত ভাবের সঙ্গে আমাদের আনন্দের অথবা বেদনার কোনো তীব্র অনুভূতি মেশানো থাকে তারাই আমাদের মনের আকাশে মেরুপ্রভার মতো সর্ব্বক্ষণের জন্য জেগে থাকে। যার সঙ্গে আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতির কোনো নিবিড় যোগ নেই তাকে আমরা মনের মধ্যে কোনো স্থায়ী আসন দান করি নে।

প্রেমকে আমরা এমনি একটা ভাব বলতে পারি যার শাসন থেকে আমাদের হৃদয় সহজে মুক্তি পায় না। আমরা যখন প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাই তখন আমাদের হৃদয়ে আর কোনো চিন্তা স্থান পায় না। আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে যায়, লজ্জা-সরম আমরা হারিয়ে ফেলি, কর্ত্তব্যকে বিস্মৃত হই, জগতের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে। বিরাট বিশ্বজগৎকে আড়াল ক'রে আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে ওঠে আমাদের কামনা। গোবিন্দলাল ভাবে কেবল রোহিণীর মুখচ্ছবি—অভাগিনী ভ্রমরকে সে ভুলে যায়। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে বিস্মৃত হয়—কুন্দনন্দিনী হ'য়ে ওঠে তার

হৃদয়ের একমাত্র অধিশ্বরী; অতিথিসৎকারে উদাসীন শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে দুর্ব্বাসার অভিশাপকে ডেকে আনে মাথার উপরে। ভালোবাসলে মানুষের সত্য সত্যই কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তার যতকিছু অনুভূতি—সব কিছুর কেন্দ্রে থাকে প্রেম। জীবন ততক্ষণই প্রিয় যতক্ষণ প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের আশা আছে। সে আশার দীপ যখন নিবে যায় তখন জীবনের প্রতি মমতাও বিলুপ্ত হয়। লেকের সুশীতল জলরাশির বুকে হতাশ প্রেমিক ঝাঁপ দেয় বিচ্ছেদের বেদনাকে ভুলবার জন্য। কাঞ্চনে আসক্তি থাকে না, খ্যাতিতে আসক্তি থাকে না, আসক্তি থাকে শুধু প্রিয়াতে। প্রিয়ার সঙ্গে যা-কিছু যুক্ত কেবল তারাই প্রেমিকের হৃদয়কে অধিকার ক'রে থাকে। প্রিয়ার সঙ্গে যোগ নেই যার তার সম্পর্কে প্রেমিকের কোনই কৌতূহল থাকে না। পাগলও ঠিক এই রকম ক'রে থাকে। তার কাছেও একান্ত সত্য কেবল নিজের সত্তা। সে কল্পনায় নিজেকে ভাবে পৃথিবীর রাজা; রাজা হওয়ার বাইরে আর যা কিছু আছে—পাগলের কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। নিজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে লুপ্ত ক'রে দেওয়া—এর নামই তো পাগলামি। পাগলের জগত কেবল তার উদ্ভট কল্পনাকে নিয়ে—প্রেমিকের জগতও কেবল তার প্রিয়াকে নিয়ে। বিপুল বিশ্ব-জগতের দাবীকে দুইজনেই সমানভাবে অস্বীকার করে। ভালবেসে মানুষ কেমন ক'রে যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে—ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। চালাক-চতুর, বুদ্ধিমান, চমৎকার ছেলে—প্রতিভার দীপ্তিতে মুখখানি

উজ্জ্বল—কিন্তু বিয়ে ক'রে আনলো এমন একটি মেয়েকে যার সঙ্গে কোনোখানেই তার মেলে না। বন্ধুগণের অনুরোধ—আত্মীয়স্বজনের মিনতি—কোন কিছুতেই সে কর্ণপাত করলো না। ভালোবাসা যখন অত্যুগ্র হ'য়ে আমাদের চিত্তকে শাসন করে—তখন সত্য সত্যই আমরা বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। নীট্‌শে পরম দুঃখেই লিখেছিলেন,

All buyers have I found cautious and cunning of eye. Yet even the most cunning buyeth his wife in a sack.

সব ক্রেতাকেই আমি দেখেছি চোখ দুটিকে খোলা রেখে বেশ সতর্কতার সঙ্গে জিনিষ কিনতে। কিন্তু বউ আনবার সময় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ক্রেতার মধ্যেও দেখেছি সতর্ক দৃষ্টির একান্ত অভাব।

তখন স্ত্রীর ধর্ম্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মত, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক মর্য্যাদা, রক্তের কৌলীন্য—কোনো কথাই মনে থাকে না। জগত সত্যই একটা পাগলা গারদ। Worthy meseemed such an one, and ripe for the meaning of earth, but when I beheld his wife, earth seemed to me a mad-house. লোকটিকে দেখে মনে হয়েছিলো একজন সত্যিকারের যোগ্য মানুষ—কিন্তু তার গৃহিণীটিকে দেখেই মনে হলো পৃথিবী উন্মাদাগার। নীট্‌শের এই কথা আদৌ অতিরঞ্জিত ব'লে মনে হয় না। গীর্জ্জা-ঘরে অথবা ছাঁদনাতলায় যখন অত্যন্ত বিসদৃশ দুটি নরনারীর পরিণয়ের দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে তখন শুধু এই কথাই মনে

জাগে, এমন ছেলে এমন মেয়েকে বাছলো কেমন ক'রে? জগতটা কি সত্য সত্যই পাগলের আড্ডা ?

কিন্তু আগেই তো বলেছি—কোনো একটা ভাব যখন অত্যুগ্র হ'য়ে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনকে অধিকার ক'রে বসে তখন সামঞ্জস্য-বোধ আমরা হারিয়ে ফেলি, আমাদের বুদ্ধির মধ্যে আর দীপ্তি থাকে না। যেমন ভালোবাসার অনুভূতি তীব্রতার আতিশয্যে আমাদের শুভবুদ্ধিকে ম্লান ক'রে দেয়—তেমনি আমাদের শুভবুদ্ধিকে হরণ করে নৈতিকজীবনে নিষ্কলঙ্ক হওয়ার উৎকট আকাঙ্ক্ষা। আমাদের নৈতিক চরিত্রকে নির্ম্মল করবার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। প্রবৃত্তির দুর্ব্বার দাবীগুলিকে বারম্বার প্রত্যাখ্যান ক'রে ক'রেই তো সভ্যতার পথে আমরা এতখানি আগিয়ে এসেছি। All progress has been brought about by the suppression of the natural impulses. কিন্তু মানুষকে নৈতিক স্তরে উন্নীত করতে গিয়ে বিধি-নিষেধের বোঝায় তার চিত্তকে আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছি। এটা খারাপ, ওটা মন্দ—এরকম করলে আমরা পশুর স্তরে নেমে যাই, ওরকম করলে আমরা মনুষ্যত্বের জ্যোতি হারিয়ে ফেলি—এই ধরণের নিষেধাজ্ঞা শোনাতে শোনাতে সুনীতির অন্ধকূপে মানুষের আত্মাকে আমরা প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছি। এমন হতভাগ্য মানুষ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ আছে যারা পাপ-পুণ্যের বাহিরে আর কোনো কথা ভাবতে পারে না, একটা অন্যায় কাজ ক'রে সারারাত চোখের জলে নৈশ উপাধান সিক্ত করে,

আত্মগ্লানির দুঃসহ তাপে নিরন্তর তারা দগ্ধ হয়। এই অভাগার দলকে মানুষের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে কেউ সচেতন করেনি। তাই একটা পাপ করলেই তারা মনে করে—জীবনে কি সর্ব্বনাশই না ঘটে গেল! মানুষকে দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত করবার এই অস্বাভাবিক চেষ্টা আজ তার নৈতিক কল্যাণের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সাহিত্যে আজ যে যৌন আলোচনার এতখানি বাড়াবাড়ি—তার কারণ বেশী জোরে বাঁধতে গিয়ে আমরা বাঁধনকে আল্গা ক'রে ফেলেছি। সমাজে বিধি-নিষেধের উৎকট আধিপত্য। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে আদিম যৌন প্রবৃত্তি নিহিত রয়েছে—সেই প্রবৃত্তি আজ তাই সাহিত্যের খাতে প্রবাহিত হ'য়ে রসের নামে পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেছে। মানুষের প্রকৃতির দাবীকে অবহেলা ক'রে নীতির দাবীকে আমরা যখন অস্বাভাবিক রকমের মর্য্যাদা দান করি তখন ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ-জীবনে এমনি পঙ্কিলতার সৃষ্টি অনিবার্য্য।

যেখানে যেখানে আমরা কোন আইডিয়াকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্য দান করবো সেখানে সেখানে সর্ব্বনাশ ঘটতে বাধ্য। আমাদের দেশে একশ্রেণীর মুসলমান ভাইরা ইস্‌লামিক সংস্কৃতির উপর অত্যন্ত বেশী জোর দিতে গিয়ে আমাদের স্বাধীনতার প্রভাতকে পিছিয়ে দিচ্ছে। জার্ম্মান আর ইটালিয়ানরা আর্য্যরক্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বেশী মাত্রায় সচেতন হ'তে গিয়ে ইহুদীসম্প্রদায়ের উপরে অযথা অত্যাচার করছে। কোরবানীর দিনে গোরু কাটা—মসজিদের সামনে বাজনা

বাজানো—এই সব তুচ্ছ ঘটনাকে বেশী মূল্য দিতে গিয়ে কত না নিরীহ মানুষের রক্তে বসুন্ধরা সিক্ত হ'চ্ছে। শান্তি ও শৃঙ্খলাকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দেওয়ার ফলে জাতি হিসাবে আমাদের আত্মপ্রকাশের পথ কতখানি রুদ্ধ হয়েছে—তার কথা কে না জানে ?

আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার লড়াই চিরদিন চলবে। কতকগুলি আইডিয়া পুরানো হয়ে যাবে—নতুন আইডিয়া এসে তাদের স্থান অধিকার করবে। যে সব আইডিয়া পুরানো হ'য়ে যায়, পরমায়ু যাদের শেষ হ'য়ে আসে—তাদের আমরা overvalued idea ব'লে থাকি। পৃথিবীতে আজ অনেক overvalued আদর্শকে সিংহাসনচ্যুত করবার সময় এসেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও পুরাতন আদর্শের ক্রীতদাস হ'য়ে আছে—তাই তাদের অপসারিত করা এত কঠিন। আমরা তাঁদেরই মহাপুরুষ বা যুগস্রষ্টা ঋষি ব'লে থাকি যাঁরা overvalued ideaগুলিকে ধ্বংস ক'রে নূতন আদর্শকে সৃষ্টি করেন। ইতিহাস আজ এই স্রষ্টাদের মুখ চেয়ে নূতন হবার অপেক্ষা করছে।

আমরা কলহ করি কেন?

এক একটা মানুষ আছে, যারা ঝগড়া না ক'রে থাকতে পারে না। পান থেকে চুণটুকু খসলে আর রক্ষা নেই—আগুনের মতো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠবে। এই দুর্ব্বাসার দল সদা-সর্ব্বদার জন্য আস্তিন গুটিয়েই আছে। এদের মেজাজের কিছুই ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না।

এই ধরণের রগ-চটা লোক যারা—তাদের মনের গভীরে উঁকি মারলে দেখা যাবে, একটা দারুণ ক্ষোভ সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে অজগর সাপের মতো। এই যে অতৃপ্তি—এই অতৃপ্তির মুলে রয়েছে একটা বিপুল নৈরাশ্য। যৌবনে তারা কত-কিছুর সোনালী স্বপ্ন নিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল অন্তরের নিভৃত মন্দিরকে। সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে বাস্তবের নির্দ্দয় আঘাতে। সে দিনের শ্যামল দিগন্ত আজ খাঁ খাঁ করছে সাহারার মরুভূমির মতো। জীবনের শূন্য-শ্মশানে ভগ্ন-হৃদয় মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখে বিচুর্ণ আশার কঙ্কালগুলিকে আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আক্রোশ তার বুকের সমাধি-ভূমিতে দিনে দিনে সঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। প্রাণের এই সঞ্চিত বিষকে তারা ছড়াতে ছড়াতে চলে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার উপরে। বুকের চাপা আগুন সংযমের আবরণ ঠেলে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায় ক্রোধের রক্তবর্ণ শিখায়। মানুষের মনের জীবনের সঙ্গে যাদের সুগভীর

পরিচয় নেই, তারা রগ-চটা লোকদের এই রকম আচরণে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যায়। ভাবে, লোকটা এমন ক'রে হঠাৎ চটে উঠল কেন? মনোবিকলন-তত্ত্ব যাদের জানা আছে—তারা দুর্ব্বাসাদের হঠাৎ রাগের কারণকে বাহিরের কোনো ঘটনার মধ্যে অন্বেষণ করে না—কারণ সে ঘটনা এতই তুচ্ছ যে, তা নিয়ে রেগে ওঠার কোনো মানেই হয় না। এত তুচ্ছ কারণ নিয়ে যখন এতখানি গাত্রজ্বালা, তখন চায়ের কাপে তুফানের পিছনে গভীর কোনো হেতু নিশ্চয়ই লুকানো আছে। আর সে কারণটি কি? অন্তরের গভীরে সঞ্চিত কোনো ক্ষোভ। যাদের নিজেদের মনের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই—তারাই আর দশজনের শক্তিকে অযথা আঘাত করে। আশা-আকাঙ্ক্ষা যাদের ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, তাদেরই মনের উষ্মা অতি তুচ্ছ কারণকে উপলক্ষ্য ক'রে ঘরে ঘরে সৃষ্টি করে বিরোধের তুমুল কলরব। কথায় কথায় যারা চটে ওঠে—তাদের ক্রোধের আগুনে ইন্ধন যোগায় অন্তরের কোনো প্রচ্ছন্ন অভিমান।

সংসারে অহরহই আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটা সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে কত না দক্ষ-যজ্ঞ ঘটে যাচ্ছে। ঝগড়া বাধার কোনই কারণ নেই, অথচ স্ত্রীর একটা কথাতেই স্বামী ভাতের থালা ছেড়ে উঠে পড়লেন, নয়ত স্বামীর সামান্য একটা বাক্য সইতে না পেরে স্ত্রী বাপের বাড়ী রওনা দিলেন। ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে মনে হবে, একটা তুচ্ছ কথার জন্য এই রকম দাম্পত্য-কলহ নিছক নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নির্ব্বোধ তো সেই—উপলক্ষ্য (provocation) এবং কারণের

(cause) মধ্যে তফাৎকে আবিষ্কার করবার মতো দৃষ্টি নেই যার। যে তুচ্ছ ঘটনাকে কলহের কারণ ব'লে মনে করছি—সে ঘটনা তো ঝগড়ার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। বিবাদের আসল কারণ রয়েছে মনের গভীরে আমাদেরই প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তির আর কামনার মধ্যে। যার প্রতি মন আমাদের বিরূপ, তার সঙ্গে অতি সহজেই আমাদের মনোমালিন্য ঘটে যায়। যাকে আমরা দেখতে পারিনে তার চলনকে আমরা সব সময়েই বাঁকা দেখে থাকি। আবার যাকে আমাদের ভালো লাগে, সে কানা হলেও আমরা তাকে সম্বোধন করি পদ্মলোচন ব'লে। ডাঃ ষ্টিকেল (Stekel) মানুষের মনের এই জটিলতা সম্পর্কে লিখেছেন,

A somewhat careful investigation of every quarrel easily brings the conviction that it is invariably the secret, unconscious emotions that bring about the conflict of opinions.

প্রত্যেকটি বিবাদের কারণ যদি তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করা যায়, তবে সহজেই দেখা যাবে, আমাদের মনের নির্জ্জান প্রদেশের গোপন অনুভূতিগুলিই মতের সঙ্গে বাধায় মতের সজ্ঘর্ষ। যেখানে মনের মধ্যে কোন গণ্ডগোল নেই, সেখানে মতের অনৈক্যকে আমরা কদাচিৎ অত্যুগ্র ক'রে দেখি। মনের সঙ্গে যদি মনের মিল থাকে—তবে মতের হাজার অনৈক্য সত্ত্বেও মিলে মিশে একত্র কাজ করা অসম্ভব হয় না। গান্ধীর সঙ্গে কি বল্লভভায়ের অথবা রাজাগোপালচারীর মতের হুবহু মিল আছে? জওহরলাল যে গান্ধীজীর অনেক মতকেই সমর্থন করেন না—সে ত তাঁর আত্মজীবনী পড়লেই জানা যায়।

কিন্তু মতের এত অমিল সত্ত্বেও তো দুজনের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন একটুও শিথিল হয় নি। অথচ ভারতবর্ষের এই দুইজন নেতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য শত্রুপক্ষের চেষ্টার একটুও ক্রটি নেই। মতের অমিল মনের অমিল ঘটাতে পারলো না কেন? কারণ দু'জনের একজনও নামের কাঙাল নন—কারও প্রতি কারও ঈর্ষা নেই। দুজনেরই জীবনের ধ্রুবতারা হ'চ্ছে জন্মভূমির মুক্তি, আর দু'জনেই জানেন—মুক্তি-সমরে কারও প্রয়োজন কারও চেয়ে কম নয়। শত্রুপক্ষেরা কংগ্রেসের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য লণ্ডনে রটনা করতে লাগলো, গান্ধীজীই ভারতবর্ষের একমাত্র নেতা—তাঁর বাক্যকেই সমস্ত দেশ বেদবাক্য ব'লে মেনে নেয়—কংগ্রেস-টংগ্রেস ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়—সুতরাং ফেডারেশনকে গ্রহণ করতে গান্ধীজী যখন প্রস্তুত তখন জওহরলালের অমত হ'লেও কিছু যায় আসে না। এই রকম সমালোচনা যখন গান্ধীর কানে এসে পৌঁছাল, তখন তিনি কি লিখলেন? গান্ধীজী লিখলেন,

On the question of Federation there never has been any difference of opinion between us. And I have made a rule for myself that so far as the Congress is concerned, if there is any unbridgeable gulf between him and me his view should prevail. And this for the very good reason that I am not in the Congress and he is in the very centre of it, and very much in touch with everything relating to the Congress.*

Harijan—1st Oct, 1938.

এর বাঙলা হ'চ্ছে, ফেডারেশন নিয়ে আমাদের মধ্যে কখনো মতের অনৈক্য ঘটে নি। নিজের কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে আমি স্থির করেছি, কংগ্রেস সম্বন্ধীয় কোনো ব্যাপারে তাঁর মধ্যে এবং আমার মধ্যে যদি এমন কোন ব্যবধান ঘটে যা দুর্লঙ্ঘ্য—তবে তাঁর মতকেই প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন। আমার এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ হচ্ছে—আমি এখন কংগ্রেসের মধ্যে নেই, কিন্তু তিনি আছেন কংগ্রেসের একেবারে কেন্দ্রে এবং কংগ্রেসের যাবতীয় ব্যাপার সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই খোঁজ-খবর রাখেন।

গান্ধীজী জওহরলালকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, জওহরলালও গান্ধীজীকে তেমনি শ্রদ্ধা করেন, আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাব এমন সুন্দর বলেই মতের পার্থক্য দু'জনের প্রেমের সম্পর্ককে একটুও আড়ষ্ট করতে পারে নি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিকক্ষেত্রে জওহরলালের এবং গান্ধীর মতবাদের পার্থক্য সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে পারতো। ভারতের সৌভাগ্যবশতই দু'জনের মতের অমিল মনের অমিল ঘটাতে পারে নি। অথচ মতের কত সামান্য পার্থক্য নিয়ে কর্ম্মীর সঙ্গে কর্ম্মীর কলহের দৃশ্য প্রতিদিন আমরা দেখতে পাচ্ছি। সভা-সমিতিতে একজন আর একজনকে লক্ষ্য ক'রে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করছে। কোলাহল এবং হাতাহাতির মধ্যে কত সম্মেলন ভেঙে যাচ্ছে। যশোহরের কর্ম্মী-সম্মেলনে একজন তো গৃহ-যুদ্ধের ফলে অকালে মারাই গেল। এক দল কর্ম্মী যাতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে ঢুকতে না পায়, তার জন্য আর এক দল কর্ম্মীর কি প্রাণপণ চেষ্টা! যাকে দেখতে পারিনে তাকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্য গুপ্তচর প্রভৃতি কত কি-ই না বলে থাকি! অথচ যারা পরস্পরকে লোকচক্ষে

হেয় করবার জন্য এমন ক'রে উঠে-প'ড়ে লেগেছে, তাদের মতের পার্থক্য যে সব সময়ে খুব বেশী তা নয়। আসলে মতের বিরোধ-টিরোধ খুব বড়ো কথা নয়। গাই-বাছুরে যদি ভাব থাকে, তবে বনে গিয়ে দুধ দেয়। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকলে তেঁতুল পাতাতেও পঞ্চাশজন একত্রে খেতে পারে, আর সদ্ভাব যদি না থাকে, তবে কলার পাতাতেও দু'জনের কুলায় না। কর্ম্মীরা যে আজ অনেক জায়গায় একত্র মিলেমিশে কাজ করতে পারছে না—তার কারণ ততটা মতের অমিল নয়—যতটা মনের অমিল। আর এই মনোমালিন্যের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ঝগড়ার মূলে রয়েছে secret, unconscious emotions. আমরা নামের অত্যন্ত কাঙাল, কর্ত্তব্যের চাইতে খ্যাতিকে মূল্য দিই বেশী, আমাদের অন্তর ক্ষুদ্রের অহমিকায় পরিপূর্ণ—তাই মতের বিরোধকে আমরা এতটা উগ্র ক'রে তুলি। নিজের চাইতে যদি দেশকে বেশী ভালবাসতাম, তবে ideological difference সত্ত্বেও একত্র মিলেমিশে কাজ করা অসম্ভব হোত না। Principle, Principle ব'লে এত যে চীৎকার করি,—Party discipline ব'লে শৃঙ্খলার এত যে দোহাই দেই—আসলে এই সব কথাগুলো কি অধিকাংশক্ষেত্রেই লীগপন্থীদের উচ্চারিত ইসলামিক কালচারের মতই শব্দমাত্র নয়—যাকে আমরা মুখোসরূপে ব্যবহার ক'রে থাকি নিজেদের ষোল আনা প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য? বাঙলাদেশে জেলায় জেলায় মতবাদ নিয়ে দলের সঙ্গে দলের এত যে কলহ—এই কলহের মূলে

শুধুই কি মতবাদের পার্থক্য, না আর কিছু—এই কথাটা মনোবিকলনতত্ত্বের চোখ দিয়ে সবাইকে একবার ভেবে দেখতে বলি।

পারিবারিক জীবনে যে সব সঙ্ঘর্ষ গৃহকে অশান্তিতে ভরিয়ে তোলে—তাদের কারণ অনেক সময়ে জটিলতার আবরণে আবৃত থাকে। একজনের উপরে রাগ ক'রে আমরা অনেক সময় গায়ের ঝাল মিটাই অন্যকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত ক'রে। রাগ করি রামের উপরে, ফল ভোগ করে বেচারা শ্যাম। শ্বশুর-বাড়ীর নাম শুনলে অনেক জামাই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। রাগটা বিশেষ ক'রে শাশুড়ীর উপরে। কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকরুণ তো মাটির মানুষ। রাগটা তা'হলে কিসের জন্য? জামাই নিজেই হয়ত রাগের যথার্থ কারণটা অবগত নয়। খুব সম্ভব বউ পছন্দ হয় নি। বউ দেখলে জামাইয়ের অন্তর রাগে রী রী ক'রে জ্বলে যায়। পত্নীর প্রতি এই যে বিতৃষ্ণা—এই বিতৃষ্ণাকে জামাই ছড়িয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কীয় যাবতীয় কুটুম্বদের উপরে। শ্যালক, শ্যালিকা, শ্বশুর, শাশুড়ী—কেউ তার রোষাগ্নির হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না। সব চেয়ে বেশী রাগ গিয়ে পড়ে শাশুড়ীর উপরে—কারণ পত্নীর অস্তিত্বের প্রধান কারণ তো সে-ই। কিন্তু স্ত্রী মনের মতন হয় নি—একথা স্বীকার করবার মত অন্তর্দৃষ্টি আছে কয়জন স্বামীর? যে কথা অনেক জামাইয়ের বেলাতে সত্য—সে কথা অনেক বধূর বেলাতে মিথ্যা নয়। এমন বধূ অনেক আছে, যাদের কাছে শ্বশুর-বাড়ীর লোক দু'চক্ষের বিষ। শ্বশুর, শাশুড়ী,

দেবর, ভাশুর, ননদ—কাউকে তারা সহ্য করতে পারে না। এরা কিন্তু কেউ বধূর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে না। সবাই চায় ঘরের বধূকে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দান করতে। রাগের আসল কারণ তবে কোথায়? খুব সম্ভব—বধূটি তার স্বামীকে আদৌ ভালবাসে না। পতির প্রতি মনের যে বিতৃষ্ণা—সেই বিতৃষ্ণার হলাহলকে সে ঢেলে দেয় স্বামীর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরে। যার গলায় সে মালা দিয়েছে—তাকে যদি বিয়ে করতে না হত তবে কিন্তু স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার মনে ভালবাসার অভাব ঘটত না। যাকে সে বিয়ে করেছে—তার সঙ্গে একত্র থাকতে বাধ্য হওয়ার জন্য বধূর অন্তরে যে ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে—সেই ক্ষোভই শেষে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে দু'চক্ষের বিষ ক'রে তোলে। একজনের উপরে রাগ ক'রে সেই রাগের বজ্রকে যখন অন্যের মাথায় নিক্ষেপ করি—তখন তাকে মনোবিকলন-তত্ত্বের ভাষায় বলা হ'য়ে থাকে 'transference' অথবা 'displacement !'

ডাঃ ষ্টিকেল 'law of transference'এর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কোন একটি ঘরের গৃহিণী অন্যের প্রতি আসক্ত ছিলো। কিছুদিন পরে নারীর ভালবাসার পাত্রটি হঠাৎ তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল। এই ঘটনার পর থেকেই বিশ্বাসঘাতিনী রমণীর আচরণে সবাই দেখলো একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন। সামান্য সামান্য কারণে বাড়ীর পরিচারিকাদের গায়ে যখন-তখন সে হাত তুলতে লাগল! গৃহিণীর দাপটে দাসীরা ভয়ে অস্থির। এই দাসীরাই কিন্তু

দু'দিন আগে তার প্রেমপত্র বহন করে নিয়ে গেছে। তখন তারা মারধরের কথা কল্পনাও করতে পারে নি। নারীর স্বভাব সহসা এমন দুর্দ্দান্ত হ'য়ে ওঠার কারণ কোথায়? যে পুরুষটি তাকে বর্জ্জন ক'রে হঠাৎ চলে গেল, তার উপরে একটা বিজাতীয় ক্রোধের অনুভূতির মধ্যেই নারীর নিষ্ঠুরতার যথার্থ কারণ নিহিত রয়েছে। যে রাগ প্রেমিকের উপরে, ক্রুদ্ধা নারীর সেই রাগ গিয়ে পড়ল হতভাগিনী দাসীগুলির নিরুপায় মস্তকে। অনেক বাড়ীতে ঝি-চাকরকে গৃহিণীর হস্তে অযথা নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। গৃহ-স্বামিনীর ভয়ে বাড়ীর দাস-দাসীরা তটস্থ। দাস-দাসীদের প্রতি গৃহিণীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আজকাল আদৌ বিরল নয়। এই রকম ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে—গৃহিণীর আসল রাগ দাস-দাসীদের উপরে নয়। রাগ আর কারও উপরে। হয়ত দাম্পত্য-জীবনে একটুও সুখ নেই। মনের সঞ্চিত ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো উচ্ছ্সিত হ'য়ে দগ্ধ করে বেচারা দাস-দাসীদের আনন্দকে।

আমরা যে আমাদের মনের কতো প্রবৃত্তিকে অন্তরের গভীরে চেপে চেপে রাখি। হঠাৎ যখন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে আমরা অত্যন্ত প্রিয়জনকে নিষ্ঠুর বাক্যে জর্জ্জরিত করি, তখন সেই ক্রোধের মধ্যে প্রকাশ পায় আমাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন ধূমায়িত ক্ষোভ। সঞ্চিত ক্ষোভের এই আকস্মিক প্রকাশই আমাদের পারিবারিক জীবনের কলহের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। যারা পরস্পরকে ভালবাসে সমস্ত অন্তর দিয়ে, তারাই আবার একে অন্যকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দান করে। অকস্মাৎ একদিন দেখা

গেলো ছ'জনের প্রেমের মধু বিদ্বেষের হলাহলে পরিণত হয়েছে। কেন এমন হয়? কারণ প্রেমিক প্রেমিকের দোষ ইচ্ছা ক'রেই দেখতে চায় না। একজন আর একজনের ত্রুটিকে ক্রমাগত উপেক্ষা ক'রে চলে। কিন্তু প্রিয়জনের অপরাধকে জোর ক'রে উপেক্ষা ক'রলেও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মনের মধ্যে যে ক্ষোভের তরঙ্গ তোলে, সে ঢেউ তো সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে যায় না। মনের অবচেতন প্রদেশে অভিমানের পর অভিমান সঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। তার পর একদিন সহসা প্রেমাস্পদের সামান্য একটা কথায় অন্তরের সেই নিরুদ্ধ অভিমান বোমার মত ফেটে পড়ে। ভালবাসা সহসা বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। এই অবদমনের তত্ত্ব ফ্রয়েডই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার ক'রে মানুষের মনোজগতের উপরে একটা নূতন আলোকপাত করেন।

আমরা সত্য সত্যই কত নির্ব্বোধ, কত অন্ধ! আমাদের দৃষ্টি কেবল উপরে উপরে ভেসে বেড়ায়—কখনো গভীরে গিয়ে পৌঁছায় না। তাই তো আমাদের প্রতিদিনের কলহগুলির কারণকে আমরা আবিষ্কার করবার জন্য বাহিরের ঘটনাগুলিকে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করি। প্রায় সমস্ত কলহের মূলেই থাকে অন্তরের কোন গূঢ় অনুভূতি।

Down there, at the bottom of the sea which represents our soul, there ever abide ugly, deformed monsters—our instincts and desires—emanating from the beginnings of man's history.

আমাদের মন সমুদ্রের মতো। সেই সমুদ্রের তলায় ভীষণকায় কদর্য্য জানোয়ারগুলি বিচরণ করছে—জানোয়ারগুলি

হ'চ্ছে আমাদেরই সহজাত প্রবৃত্তি আর কামনা, যাদের আমরা বহন ক'রে এনেছি মানুষের ইতিহাসের আদিম-যুগ থেকে। মনের অতলে জানোয়ারগুলি তাদের পুচ্ছ সঞ্চালন করে—উপরের জল কেঁপে কেঁপে ওঠে—আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়—আমরা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠি। নির্ব্বোধেরা মনে করে—সমুদ্রের বুকে চাঞ্চল্য জাগার কারণ বাহিরের বাতাস; জ্ঞানীরা জানে, সাগর-বক্ষ আন্দোলিত হওয়ার মূলে বাহিরের বাতাস নয়—ভিতরের কদর্য্য জানোয়ার-গুলির ভীষণ পুচ্ছ-সঞ্চালন। আমাদের রাগের আসল কারণ অধিকাংশক্ষেত্রেই আমাদের মনের অতল প্রদেশের বিশ্রী প্রবৃত্তি-গুলি—আমাদের ঈর্ষা, আমাদের পরশ্রীকাতরতা, অন্যের উপরে আমাদের প্রভুত্ব করবার উৎকট কামনা। বাহিরের ঘটনা—ঝগড়ার উপলক্ষ্য মাত্র; কলহের আসল কারণ অন্তরের প্রচ্ছন্ন কামনায়।

ছুটির বাঁশি

ছুটির প্রতি আমাদের মজ্জাগত একটা আকর্ষণ আছে। ছেলে-বেলায় ইস্কুল যাবার সময় বৃষ্টি যেদিন ঝেঁপে আসতো সেদিন আনন্দের আর সীমা থাকতো না। বাগানের ডোবাটা কানায় কানায় ভরে যেতো বৃষ্টির জলে—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ডেকে যেতো পুলকের বান। কি মজা! দেবতার অনুগ্রহ ইস্কুলে যাবার দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে! অঙ্কের ক্লাশে বোর্ডের সামনে চক্ হাতে দাঁড়ানো আর সাক্ষাৎ যমের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো প্রায় একই কথা! বৃষ্টি যখন কৃপা ক'রেছে তখন অঙ্কের মাষ্টারের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির হাত থেকে একদিনের জন্যও তো নিস্তার পাওয়া গেল! তারপর পণ্ডিতমশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে উপক্রমণিকার ধাতুরূপ আর শব্দরূপ মুখস্থ বলা—সে জীবনের আর এক পরম দুর্ভাগ্য! দেবতার দয়া বৃষ্টির বেশে এসে এ দুর্ভাগ্যের হাত থেকেও মুক্তি দিয়েছে! ইস্কুলে যাবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এমনি বৃষ্টি যদি রোজ রোজ আসতো! বৃষ্টি যেদিন ইস্কুল বসবার ঠিক পূর্ব্ব মূহূর্ত্তেই থেমে যেতো—নৈরাশ্যের মেঘ ছেয়ে ফেলতো মনের আকাশকে! পুলকের আতিশয্যে স্ফীত হৃদয় খোঁচা-খাওয়া বেলুনের মতোই সহসা যেতো চুপ্‌সে। গত্যন্তর না দেখে নালার জলে কোঁচা ভিজিয়ে ছুটির জন্য হেড্‌মাষ্টারমশায়ের দ্বারস্থ হতে

হোতো। ছেলে-বেলায় জলে-ভেজা জামা-কাপড় দেখিয়ে বর্ষার দিনে শিক্ষকের কাছ থেকে ছুটি আদায়ের সেই যে প্রাণপণ প্রয়াস—সেই প্রয়াসের মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই কর্ম্ম-বন্ধনকে এড়িয়ে যাবার জন্য মানুষের মুক্তি-পিপাসু হৃদয়ের মধ্যে যে একটা দুর্ব্বার কামনা রয়েছে—তারই প্রকাশ। এই কামনার জন্যই ছেলেবেলায় মাষ্টার-মশাইয়ের অসুখের কথা শুনলে মনটা আনন্দে নেচে উঠতো। ইস্কুলে মাষ্টারের অনুপস্থিতি মানে ক্লাশের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি। ছুটির প্রতি মানুষের এই যে একটা প্রচণ্ড লোভ—এই লোভের কথা জেনেই আমাদের ঋষিরা কর্ম্মের উপরে বারম্বার এতখানি জোর দিয়েছেন। কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনের ফলেই সামাজিক সম্পদের সৃষ্টি। ছুটির কাজ-ভোলানো বাঁশি এই কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তন যদি থামিয়ে দিতো তবে সর্ব্বনাশ দেখা দিতো আমাদের সমাজ-জীবনে। তাই শাস্ত্র কর্ম্মবিমুখ অলসকে ফেলে দিয়েছে চোরের পর্য্যায়ে। স্বীকার করতে হবে—কর্ম্ম-যোগের উপরে জোর দিয়ে শাস্ত্রকারেরা ভালোই করেছেন।

কিন্তু শাস্ত্রের বিধান দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা কর্ম্মের প্রয়োজনকে অত্যুগ্র ক'রে দেখতে গিয়ে ছুটির প্রয়োজনকে তো অস্বীকার করেন নি! পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে মাঝে মাঝে এত যে ছুটির ব্যবস্থা—এর মূলে রয়েছে আমাদের শাস্ত্রকারদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি। পূজা-পার্ব্বণের দিনগুলিতে তাঁরা মানুষকে কাজের দায় থেকে দিয়েছেন মুক্তি। যে দিনগুলিকে

তাঁরা holy ব'লে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সেগুলিকে আমরা ব'লে আসছি holidays. মানুষ কি কলের পুতুল যে তাকে রোজ রোজই কাজ ক'রে যেতে হ'বে? তার মধ্যে নেই কি সেই মুক্তি-পিপাসু আত্মা যা নীরব রাত্রে শুনতে চায় তারার বাঁশী? তার মধ্যে নেই কি সেই সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন যা ভেসে যেতে চায় সূর্য্যকরোজ্জ্বল নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে? আমরা তো যন্ত্র নই। তাই কাজ করতে করতে প্রাণ আমাদের হাঁপিয়ে ওঠে কর্ম্মের দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্য! আমরা তখন শহর থেকে পালিয়ে যাই পৃথিবীর কোন নিভৃত কোণে। সেখানে ঘাসের উপরে শুয়ে আকাশের নীলিমার দিকে চেয়ে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে; পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলে ছিপটি ফেলে সারা বেলা মাছ ধরি ব'সে ব'সে; নৌকার পাটাতনের উপর সতরঞ্চি বিছিয়ে সেখানে শুয়ে শুয়ে শুনি দাঁড় ফেলার ছপ্ ছপ্ শব্দ আর জলধারার অবিরাম কলস্বর। প্রকৃতির নিভৃত বুকে কালের স্রোতে গা-ভাসিয়ে চলতে চলতে আমাদের মন থেকে অবসাদের বোঝা কখন নেমে যায়, ক্লান্ত মন পুনরায় সজীব হ'য়ে ওঠে, আলস্য আর ভালো লাগে না, কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য চিত্তের মধ্যে জাগে চাঞ্চল্য! মানুষের মনের এই রহস্যটুকু যাঁদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিলো তাঁরা ছুটির দাবীকে উপেক্ষা করতে পারেন নি! বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের তাই ব্যবস্থা আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিরও ব্যবস্থা! সরস্বতী-পূজার শিশিরস্নাত প্রভাত! কাঁধের উপরে কাজের কোনো যোঁয়াল নেই! আফিস নেই, ইস্কুল নেই! সকাল-

বেলাকার শীতের আকাশ মুখরিত হ'য়ে উঠেছে ঢাকের শব্দে, শানাইয়ের শব্দে। ছেলেরা দল বেঁধে ছুটেছে মাঠে মাঠে বনে বনে পলাশ, কাঞ্চন, পদ্ম আর যবের শীষ সংগ্রহ করবার জন্য! এলো দোলের দিন! দোলমঞ্চে ঠাকুর দুলছেন আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জগতে আরম্ভ হ'য়ে গেছে হোলির উৎসব! আবীরে আর কুঙ্কুমে রঙা হ'য়ে উঠ্‌লো কত সুন্দরীর মুখচন্দ্র, পিচকারীর রঙে রঙীন হ'য়ে গেলো গাছের পাতা, পথের ধূলি! দুর্গোৎসবের দিনগুলিও কোটি কোটি ক্লান্ত নরনারীর কাছে কত না আনন্দের দিন! কাজের তাড়া নেই, কর্ত্তব্যের দায় নেই! সামনে পড়ে আছে ছুটির মধুময় দিনগুলি! চির-পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কি অপূর্ব্ব আনন্দ! শিউলিফুলের গন্ধে-ভরা শুক্লারজনী মুখর হ'য়ে উঠেছে প্রতিবেশীদের হাস্যকলরবে! পল্লীতে পল্লীতে শোনা যায় আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। হিন্দুধর্ম্ম তার উদার বক্ষে এত মানুষকে যে টানতে পেরেছে তার একটা কারণ, হয়তো, হিন্দুধর্ম্মে পূজা-পার্ব্বণের এতো আধিক্য আর এই পূজা-পার্ব্বণগুলি মনুষকে দিয়েছে কাজের দায় থেকে মুক্তি। ছেলে-বুড়ো—সবাই যে কাজের দায় থেকে মুক্তি চায়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তাই ব'লে এ কথা সত্যি নয় যে, নিরবচ্ছিন্ন ছুটির মধ্যে কোনো আনন্দ আছে।

Idleness, like kisses, to be sweet must be stolen.

জীবনের যা কিছু মাধুর্য্য—সে বৈচিত্র্যের মধ্যেই। যা একঘেয়ে তা হাজার ভালো হ'লেও তার মধ্যে আমাদের

সুখ নেই। ছুটির বাঁশি কানে যতই মধুর লাগুক—এক সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে ছুটি ভোগ করতে করতে আমাদের কাছে আলস্য অবশেষে দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। Hell is a place where there is perpetual holiday—শ'এর একথা সত্য। তবুও বলবো—কাজ না করতে হ'লেই আমরা খুসী হই। আমরা যে কাজ করি সে ততটা নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়—যতটা অন্যের প্রয়োজনের জন্য! নিজের বেঁচে থাকার জন্য কতটুকু আর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়! কিন্তু যারা ভরণপোষণের জন্য আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য খাটুনীর দায়কে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কর্ত্তব্যপালনের জন্য আমাদের সবাইকে পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু পরিশ্রম ক'রে আনন্দ পায়—এমন লোকের সংখ্যা কি আঙ্গুলে গণনা করা যায় না? ছুটি প্রতি মুহূর্ত্তে কানের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি বলে, "রেখে দাও কাজের বোঝা, ফেলে রাখো গৃহকর্ম্ম, চল যাই সেখানে যেখানে নদীর তীরে তীরে কাশফুলের হাসি, বনে বনে পাখীদের কাকলী; সেইখানে বিনাকাজে সারাবেলা কেটে যাক বাঁশী বাজিয়ে আর স্বপ্ন দেখে।" কিন্তু কর্ত্তব্যবোধ স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের বহুবিধ দায়িত্বের কথা; ছুটির মোহকে জয় ক'রে আমরা তখন দিনের কাজে ব্রতী হই। শীতের সকাল। মন কিছুতেই চায় না লেপের উত্তাপকে ছাড়্তে। আলস্য বলে, আর একটু ঘুমিয়ে থাকো—এমন তপ্ত কোমল শয্যা! এত তাড়াতাড়ি নাই বা উঠলে! সে আহ্বান উপেক্ষা করতে

পারি না আমরা ; তন্দ্রার মধ্যে আরও কয়েক মিনিট কেটে যায়। উঠি, উঠি ক'রেও ওঠা হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধ শেষ পর্য্যন্ত শুয়ে থাকতে দেয় না। শয্যা ছেড়ে উঠে এসে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলি একে একে আরম্ভ করতে হয়। সকালের সূর্য্য শেষে অপরাহ্ণের আকাশে এসে পৌঁছায়! ইচ্ছা করে—বিকালবেলা চুপচাপ কোথাও ব'সে কাটিয়ে দিই। কাজের তাড়নায় শেষ পর্য্যন্ত এ ইচ্ছাকেও বর্জ্জন করতে হয়! এমনি ক'রেই প্রতি মুহূর্ত্তে আলস্যের মোহকে জয় করতে করতে আমাদের আগিয়ে যেতে হয় কর্ত্তব্যের পথে।

কর্ম্মের সঙ্গে আলস্যের এই যে দ্বন্দ্ব—এ দ্বন্দ্বের সত্যই কোনো বিরাম নেই জীবনে। রবীন্দ্রনাথের 'অশেষ' নামক কবিতাটিতে এই দ্বন্দ্বের ছবিই করুণ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, সহচরেরা সব পরলোকে, সমস্ত জীবন কেটে গেলো বিপুল কর্ম্মের মধ্য দিয়ে, এখন মন চায় বিশ্রামের সুশীতল অঙ্ক। কিন্তু সুতীব্র কর্ত্তব্যবোধ। সে তো কবিকে বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করতে দেবে না! ক্লান্তি যখন প্রিয়ার মিনতির মতো সমস্ত অঙ্গকে টানছে—ঘুমে চক্ষু-দুটি যখন নিমীলিত হ'য়ে আসছে—তখনো কর্ম্মের দায় থেকে নিস্তার নেই!

নয়ন পল্লব পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান ;
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম
এখনো আহ্বান ?

কর্ত্তব্য—সে সদা-জাগ্রত রাণীর মতো। কবি তার তুলনা দিয়েছেন 'রক্ত-লোভাতুরা কঠোর স্বামিনী'র সঙ্গে। সে মোহিনী, সে নিষ্ঠুরা, তার আদেশকে অমান্য করা দুঃসাধ্য। সে স্বপ্নের নীড় ভেঙে দিয়ে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায় কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে। সংসারের সমস্ত দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে আমরা যখন নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পার-ঘাটায় এসে বসি, তখনও সে অব্যাহতি দেয় না। হাতে জয়-ধ্বজা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় কর্ম্মজীবনের প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে। এই কর্ত্তব্যকে উপলক্ষ্য ক'রেই কবি লিখলেন,

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্ত-লোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী,
জগতে সবারই আছে সংসার-সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?

শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের আহ্বানই জয়ী হোলো কবির জীবনে। কর্ম্মের উন্মাদনা আর ছুটির লোভ—এ দু'য়ের মধ্যে কর্ম্মের উন্মাদনার কাছে ছুটির লোভ পরাজয় স্বীকার কোরলো। কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হলো,

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,

মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া ছুটি চোখ
যত্নে-গাঁথা মালা।
খেয়া-তরী যাক ব'য়ে গৃহে-ফেরা লোক ল'য়ে
ওপারের গ্রামে
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে প'ড়ে যাক খসি
কুটীরের বামে!
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান!

বলাকার 'শঙ্খ' নামক কবিতার মধ্যেও ঠিক এই রকম ভাবেরই কয়েকটি লাইন আছে।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথবো রক্ত-জবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাবো বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাক্‌ল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ॥

এখানেও একদিকে বিরামের আশা এবং আর একদিকে কর্ম্মের আহ্বান আর এ দুইয়ের দ্বন্দ্বে কর্ম্মের আহ্বানই জয়লাভ করেছে। কবির কাব্যে এই যে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বের ছবি ফুটে উঠেছে—এই দ্বন্দ্বই সব মানুষের জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিঃশব্দে ঘটে চলেছে। একদিকে কাজ—আর একদিকে আলস্য, একদিকে কর্ত্তব্যের শঙ্খধ্বনি এবং আর একদিকে ছুটির কাজ-ভোলানো বাঁশি!

কর্ম্মের গুণগান এ পর্য্যন্ত বহু মহাজনের মুখে কীর্ত্তিত হ'য়ে এসেছে। তার গুণগান এ প্রবন্ধে নূতন ক'রে না করলেও চলবে। কর্ম্মের মতো অলসতারও মাঝে মাঝে যে প্রয়োজন আছে—এই কথাটা বলবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। 'অলস লোকের মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা', 'যে কাজ করে না সে চোর'—এই ধরণের অনেক কথা ছেলেবেলা থেকে শুনতে শুনতে আমরা ভুলে যাই—মাঝে মাঝে কাজ না করারও একটা সার্থকতা আছে। কাজ করতে করতে আমাদের মন ক্লান্তিতে ভ'রে ওঠে। তখন আমরা ছুটির জন্য অধীর হই। মনের এই রকম অবস্থাতেও যারা সমানে কাজ ক'রে চলে ছুটির দাবীকে বারম্বার প্রত্যাখান ক'রে—তাদের শরীর একদিন ভেঙে পড়ে—কাজ করবার শক্তিও হ্রাস পায়। Dr. Stekel কর্ম্মের ক্রীতদাসদের শারীরিক অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ কথা লিখেছেন। তাঁর মতে

Not at all infrequently illness is only a refuge in idleness, a defence against a hypertrophied impulse to work.

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—ক্লান্ত দেহকে খাটুনীর হাত থেকে রেহাই দেবার গোপন ইচ্ছাই অসুখের আসল কারণ। শরীর আর খাটতে কিছুতেই চায় না—মনের গভীরে বিশ্রামের জন্য সে কি নিবিড় কামনা! কিন্তু চেতন মনে রয়েছে কাজের মোহ। বিশ্রামের কামনাকে সে কিছুতেই দেবেনা প্রশ্রয়! তখন উপায়ান্তর না দেখে আমাদের গোপন ইচ্ছা এমন কোন আশ্রয় খোঁজে যা দেহকে কাজের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। এই আশ্রয় হোলো অসুখ। আমার মনের চেতন প্রদেশে যখন কাজের মোহ—আমার মনের নির্জ্জান প্রদেশে তখন অসুখের জন্য নিবিড় কামনা। অসুখ না করলে ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেবার আর যে কোনো উপায় নেই। কাজের দুর্ব্বহ ভার থেকে শরীরকে মুক্তি দেবার জন্য যারা অসুখকে এমনি ক'রে ডেকে আনে তাদের মনের নির্জ্জান দেশকে ভালো ক'রে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, কাজের ভয়ই তাদের আরোগ্য লাভের পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায়। অবাঞ্ছিত কোনো কিছুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অসুস্থতাকে এমনি ক'রে ডেকে আনাকে Dr. Stekel বলেছেন refuge in disease. ছেলেবেলায় পরীক্ষা দেবার ভয়ে আমরা অনেকেই মনে মনে চেয়েছি, এখন অসুখ হ'লে বেশ হয়—পরীক্ষার দায় থেকে তা হ'লে বাঁচা যায়! এই যে শিশুসুলভ মনোবৃত্তি—এই মনোবৃত্তি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। যাকে আমরা হিষ্টিরিয়া ব'লে থাকি তার তো একটা বড় কারণ হচ্ছে অসুখের আশ্রয়

নিয়ে, যা চাইনে, তার হাত এড়ানোর গোপন ইচ্ছা। আমাদের অনেক অসুখের মূলেই আমাদের গোপন মনের কামনা—অসুখকে চাই ব'লেই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের শরীর বেঁকে বসে। এই অসুস্থতা দূর করবার উপায় বীজাণুর পরীক্ষা নয়—মনের বিশ্লেষণ।

উপসংহারে আমরা এই কথাই বলতে চাই—কাজের উপরে যেমন মানুষের অধিকার থাকা উচিত—আলস্যের উপরেও তেমনি তার অধিকার থাকা আবশ্যক। Right to workই যথেষ্ট নয়; Right to leisureএরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আলস্য কথাটা শুনলে নাসিকা কুঞ্চিত করবার কোনো প্রয়োজন নেই। ছেলেবেলাতে সেই যে মাষ্টারের মুখে শুনতাম 'পড়া তৈরী হয়েছে?'—সেই কথাটা আমাদের কানে আজও লেগে আছে। তাই, কাজ না করারও যে একটা মূল্য আছে—সে কথাটাকে আমাদের মন আমল দিতে চায় না। ছুটি চাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে দোষের কিছুই নেই। জীবনে ছুটির প্রয়োজন কাজের প্রয়োজনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

দর্পণের দাস

Ultimately every one of us is egocentric. আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে। আয়নার ঘরে দিবারাত্র আমরা বাস করি। নিজের চেহারাটাকে নিয়ে সত্য সত্যই আমরা বড়ো বেশী ব্যস্ত থাকি। এমন মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে যারা সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বারম্বার ভাবে, "আমায় আজ দেখাচ্ছে কেমন?" নিজেকে আমরা বড্ডো বেশী ভালোবাসি কিনা—তাই দর্পণ আমাদের জীবনে এতখানি স্থান অধিকার ক'রে আছে।

মানুষের আত্মপ্রীতির তীব্রতা সম্পর্কে ভারি একটা মজার গল্প আছে। কোন এক রাজা ঘোষণা করেছিলেন, এই আয়নাখানিকে অতিক্রম করবার সময় যে লোক একটিবারের জন্যও এর প্রতি দৃষ্টি না দেবে তারই হস্তে আমার কন্যারত্নকে সম্প্রদান করবো। আয়নার কাছে যে আসে সে-ই একবার দেখে নেয় নিজের চেহারাখানা—রাজকন্যাকে বিয়ে করা কারও অদৃষ্টে ঘটে ওঠে না। অবশেষে এলো এক কবি আর তারই হস্তে রাজা সম্প্রদান করলেন তাঁর কন্যাকে। কবিটি, বোধ হয়, আপনার মনের দর্পণে তন্ময় হ'য়ে দেখছিলো তার অহংকে—তাই কাচের দর্পণে নিজের বাহিরের রূপকে দেখবার অবসর ঘটেনি তার! হায়, মুকুরে আমাদের চেহারা দেখতে গিয়ে

জীবনের কতো অমূল্য সময় আমরা বৃথাই নষ্ট ক'রে ফেলি! চুলের উপর দিয়ে চিরুণী বারম্বার যাতায়াত করে আর মূহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত বিনাকাজে অতিবাহিত হ'য়ে যায়। আজকাল হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ছোট আয়না-চিরুণী রাখা একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আগে এই ফ্যাসানটা সীমাবদ্ধ ছিলো ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের তরুণীদের মধ্যে। এখন আমাদের ঘরের মেয়েরাও ফিরিঙ্গী তরুণীদের অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছে। ট্রামে, বাসে, নয়তো ট্রেণে চলেছো। তোমার সামনের সিটে ব'সে আছে একটি নবযৌবনা সুন্দরী। কোথাও কিছু নেই—সুন্দরী গাড়ীশুদ্ধ সকলের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সামনে সহসা দর্পণখানি হাতে নিয়ে কেশবিন্যাস সুরু করে দিলেন। আমাদের অনভ্যস্ত চোখে এই রকম দৃশ্য কি রকম যে দৃষ্টিকটু লাগে! ভক্তদের জপের মালার মতো পথে ঘাটে আয়না-চিরুণী সঙ্গে থাকাই চাই। এই রকম ক'রে বারে বারে আয়নায় মুখ দেখার অভ্যাস—এও মনের এক রকম ব্যাধি! আমাকে আজ দেখাচ্ছে কেমন—এই চিন্তাকে যারা প্রাধান্য দেয়, জীবনের কারবারে তারা সব সময়ে সুবিধা করতে পারে না।

আমাদের দেশে চলতি কথা আছে, 'সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা।' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ-সজ্জা নিয়ে যারা বৃথা কালক্ষেপ করে তাদের লক্ষ্য ক'রে এই চলতি কথাটার প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। চুল আঁচড়াচ্ছে তো আঁচড়াচ্ছেই! আঁচড়াতে আঁচড়াতে হাত ব্যথা হ'য়ে যায়, বাইরে যারা অপেক্ষা ক'রে আছে তাদের কাছ থেকে ডাকের উপর ডাক আসে, গাড়োয়ান

বাইরে কলরব সুরু ক'রে দেয়, তবুও চুল আঁচড়ানো ঠিক মনের মতন হয় না! চুল আঁচড়ানো যদিও বা শেষ হোলো, কাপড় পরা কি তুতেই শেষ হ'তে চায় না। সাড়ীর পর সাড়ী বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে, পাঞ্জাবীর পর পাঞ্জাবী গায়ে ওঠে! অনেক বিচার-বিবেচনার পর যখন সাজ-সজ্জার কাজ সমাপ্ত হয়, তখন হয়তো গাড়ী ধরবার আর সময় থাকে না, ছটার শো দেখার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নয়তো নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল—প্রতীক্ষ্যমান গৃহস্বামীর ধৈর্য্য প্রায় বাঁধ ভাঙার উপক্রম করেছে।

সেজেগুজে রাস্তায় যদি বা বেরুনো গেল, তখন আবার আর এক উৎপাত! লোকে তাকে নিশ্চয়ই খুব মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছে! বাসের পিছনের বেঞ্চির কোণের লোকটা তার দিকে অমন ক'রে বারে বারে তাকাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোনোখানে কোনো ত্রুটি আছে! ট্রেনের সামনের বেঞ্চিতে লোকতুটো এতক্ষণ ধ'রে কি ফিস্‌ফাস্ করছে? তার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে অমন হাসছেই বা কেন? সমালোচনার কারণ তার নতুন জুতাজোড়া নয় তো? জামার রংটা অন্য রকমের অথবা নাকের গড়নটা অন্য ধরণের হোলে হয়তো লোকজনের হাসাহাসির অমন কারণ ঘটতো না। বেচারা বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি আয়না দেখে আর দর্পণে প্রতিবিম্বিত নাকটির পুনঃ পুনঃ সমালোচনা করে! নাসিকার উচ্চতার দিক দিয়ে তো বলবার কিছু নেই—কিন্তু ওষ্ঠের কাছটাতে কি বিশ্রী ভোঁতা! বিধাতা আর একটু সদয় হ'য়ে নাকটাকে তো গরুড়ের মতো করতে পারতেন আর তা হ'লে

গাড়ীতে লোকদুটি কি অমন ক'রে ফিস্‌ফাস্ করতে পারতো ? কিন্তু সমালোচনার কারণ নাকটি না কটা-কটা মণি-দুটি ? চোখের মণি যদি কটা না হয়ে কালো হোতো কি চমৎকারই না তাকে দেখাতো ! বেচারা আয়নার দিকে তাকায় আর কটা চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে !

দর্পণের দাস যে, তার সব চেয়ে অসুবিধা হ'চ্ছে চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্যের একান্ত অভাব ! নিজের চেহারাটা যদি নিজের কাছে ভালো না লাগলো—তবে সব সময়ে তার মনের মধ্যে জেগে থাকবে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব ! পরিচিত অপরিচিত—সবাইকে সে এড়িয়ে চলবে। ট্রামে এমন জায়গায় সে বসবে যেখানে বসলে তার মুখ কেউ ভালো করে দেখতে পাবে না। থিয়েটারের হল পূর্ণ হবার অনেক আগেই সে তার আসনটি অধিকার করবে—পাছে লোকের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তাকে ! সে জনারণ্যের মধ্যে আপনাকে গোপন রাখতে চায় !

নিজের চেহারার সৌন্দর্য্যের উপরে যাদের বিশ্বাস অবিচলিত—তাদেরও গতিবিধির মধ্যে একটা সহজ ছন্দের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যারা নিজেদের রূপ সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী সচেতন তাদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত থাকে অপরের হৃদয় জয় করবার দিকে। বিশেষ ক'রে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার দিকে বড্ডো বেশী নজর দেয় তারা।

কাচের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একদল লোক যেমন আপনাদের বাহিরের চেহারাটাকে নিয়ে বড্ডো বেশী মাথা

ঘামায়, তেমনি আর একদল লোক আছে যারা আত্মার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের আচরণের ভালোমন্দ বিবেচনা নিয়ে বড্ডো বেশী ব্যস্ত থাকে। তাদের কাছে তাদের মনের চেহারাটা সর্ব্ব-সময়ের জন্য সুতীব্র সমালোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। একটা পুণ্য কাজ ক'রে তারা মনে মনে বারম্বার বলে, আমি কত ভালো! আবার একটা মন্দ কাজ ক'রেও বারম্বার তারা উচ্চারণ করে, আমি কি নরাধম! তাদের আত্মপ্রশংসাও যেমন অস্বাভাবিক, তাদের আত্মনিন্দাও তেমনি অস্বাভাবিক। আত্মপরীক্ষা নিয়ে তারা সব সময়ে ব্যস্ত! নিজের কাছে নিজের পূজোর নৈবেদ্য নিবেদন করতে তারা যেমন উৎসাহী—নিজেকে অপরাধী বিবেচনা ক'রে চুল ছিঁড়তে, ললাটে করাঘাত করতে এবং অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতেও তারা তেমনি উৎসাহ প্রদর্শন ক'রে থাকে!

পাছে লোকে কিছু বলে—এই ভয়ে যারা সসব্যস্ত, জগৎটা তাদের কাছে মস্ত একটা দর্পণের ঘর। জীবনের পথে চলবার সময় সদাসর্ব্বদার জন্য তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নিজেদের উপরে। কোনো একটা কাজ করবার আগে পঞ্চাশ বার ক'রে সে ভাবে—লোকে আমার কাজে খুসী হবে তো? এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে এসে পরদিন তাড়াতাড়ি কাগজ খোলে—সম্পাদকেরা কি মন্তব্য ক'রেছে তাই দেখবার জন্য। মন্তব্য যদি প্রতিকূল হয় প্রাণের মধ্যে সহস্র বোলতার যেন হুল ফুটতে থাকে,—আর যদি তাতে বক্তার প্রশংসা থাকে তবে তো পৃথিবী ক্ষণকালের জন্য স্বর্গ হ'য়ে যায়! দর্পণ-দাসেরা কখনও আদর্শের

পূজাকে লোকমতের উচ্চে স্থান দিতে পারে না। সবাইকে খুসী করাই তার জীবনের ব্রত। এমন কিছু সে করবে না যাতে লোকে অসুখী হয়—এমন কিছু সে বলবে না যাতে পাড়া-প্রতিবাসী চটে যায়, এমন কিছু সে লিখবে না যাতে দেশবাসীর মনে আঘাত লাগে। এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা চারপাশে দেখতে পাই যারা জল উঁচু বললে বলে জল উঁচু এবং জল নীচু বললে বলে জল নীচু, যারা কখনো চটে না, কখনো কাউকে চটায় না, যাদের কণ্ঠ থেকে কখনো প্রতিবাদের সুর উৎসারিত হয় না, যারা নম্রতায় তৃণকে এবং মৃদুতায় মেষশিশুকেও হার মানিয়ে দেয়, দাঁতের আগায় হাসিটি জাগিয়ে রেখে সব সময় যারা মানুষের মন যুগিয়ে চলে, এরা আসলে হোলো দর্পণের দাস। নিজেকে তারা রেখেছে সংসারের কেন্দ্রস্থলে, সকলের যেন প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারি—এই আদর্শই তাদের জীবনকে প্রবলভাবে শাসন করে। পৃথিবীর মঙ্গল নয়, সত্যের জয় নয়, নিজের খ্যাতি—এইটাই হোলো তাদের জীবনের আকাশে ধ্রুবতারা। তারা কায়া নয়—ছায়া, ধ্বনি নয়—প্রতিধ্বনি।

এদের মন সতেজ নয়, সবল নয়, রুগ্ন। আর মন যে এদের এমন রুগ্ন—তার কারণ ছেলেবেলায় শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটি। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে শৈশবে যে সব ধারণা প্রবেশ করিয়ে দিই—তারাই তো তাদের মনের কঠামো-টাকে তৈরী করে। এমন পিতামাতা হাজারে হাজারে রয়েছেন যাঁরা ছেলেমেয়ের মনে লোকের প্রশংসা কুড়াবার বাসনাকে

অযথা বলবতী ক'রে তোলেন। ছেলে একটা কিছু করলে অথবা বললে সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মা তার দৃষ্টিকে অপরের মতামতের প্রতি আকর্ষণ ক'রে থাকেন। ছেলে মন্দ কিছু করলে অমনি পিতা-মাতা তার কানে শুনিয়ে থাকেন, 'ছি অমন করতে নেই, লোকে নিন্দা করবে।' ছেলে খারাপ কিছু বললে অমনি তাকে শোনানো হয়, 'ছি লোকে মন্দ বলবে।' ছেলে যদি প্রশংসনীয় কিছু করলো তবে অনেক বাপ-মা তাকে মাথায় নিয়ে নাচেন। তার প্রতিভা যে অলোকসামান্য—এই কথা শুনতে শুনতে ছোটো ছেলে নিজেকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিতে শেখে। লোকের খ্যাতি কুড়াবার আকাঙ্ক্ষা যে আমাদের প্রায় সকলের চিত্তকেই এমনভাবে জুড়ে আছে—তার মূলে রয়েছে আমাদের শৈশবের সংস্কার। এই খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাই তো মানুষের মেরুদণ্ডকে সোজা হ'তে দেয় না। পাছে লোকে কিছু বলে—এই ভয়ে আপনাকে আজীবন অবগুণ্ঠিত ক'রে রাখে। ছেলেমেয়েদের শেখানো উচিত—কর্ত্তব্য করার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়—সেই আনন্দই মানুষের লক্ষ্য হওয়া সমীচীন। অন্যের প্রশংসা কুড়ানোর মধ্যে তৃপ্তিকে যারা খুঁজে বেড়ায়—সেই মেরুদণ্ডহীন আনন্দের কাঙালেরা কৃপার পাত্র। আনন্দের অনুভূতির জন্য যারা পুষ্পমাল্যের আর করতালির অপেক্ষা করে, তারা কি মূর্খ নয়? আনন্দকে অনুভব করতে হবে নিজের মধ্যে। লোকে কি বললো না বললো—তার উপরে যাদের সুখ নির্ভর করে—তারা কোনো-দিন সুখী হয় না—মনের স্বাস্থ্য কাকে বলে তাও তারা জানে

না। এইজন্য গীতায় বলা হয়েছে—আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ স্তদোচ্যতে। আপনার মধ্যে যারা আনন্দের সন্ধান পেয়েছে, তারাই স্থিতপ্রজ্ঞ। Dr. Stekelও ঠিক এই কথাই বলেছেন।

One who has learned to consider contentment with oneself—not self-satisfaction based on vanity and arrogance—as worth more than what people say about one has found the way to health and happiness.

বাহির দ্বারের যে দক্ষিণা
অন্তরে নিওনা টেনে ; এ মুদ্রার স্বর্ণলেপটুকু
দিনে দিনে হাতে হাতে ক্ষয় হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে যাবে,
উঠিবে কলঙ্করেখা ফুটি। ফল যদি ফলায়েছ বনে
মাটিতে ফেলিয়া তার হোক অবসান। সাঙ্গ হোলো
ফুল ফোটাবার ঋতু, সেই সঙ্গে সাঙ্গ হ'য়ে যাক
লোকমুখবচনের নিঃশ্বাসপবনে দোল খাওয়া।
পুরস্কার প্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়োনা হাত
যেতে যেতে ; জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিও না তারে ; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা। *

* রবীন্দ্রনাথ—প্রান্তিক

ক্ষুদ্রের অহমিকা

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একবার কোন লোক কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলো, 'মশাই, অমুক লোক আপনার ভারী নিন্দা করে।' লোকটির মুখের দিকে চেয়ে বিদ্যাসাগর সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'কই, আমি তো তার কোনো উপকার করি নি।' নরনারীর মনের জীবনকে অত্যন্ত গভীরভাবে জানলে তবেই মানুষ সম্পর্কে মানুষ এমন সাংঘাতিক ব্যঙ্গোক্তি করতে সাহস পায়। জীবনের গভীর সত্যগুলিকে তারাই জানতে পারে যাদের সঙ্গে জীবনের নিবিড় একটা যোগ আছে। বই পড়ে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক হওয়া যায়—মনস্তত্ত্ববিদ হওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক না হ'য়েও মনোবিকলনতত্ত্বের একটা সূক্ষ্ম কথা যে এমন ক'রে ধরতে পেরেছিলেন তার কারণ, জীবনের হাট থেকে আপনাকে তিনি সরিয়ে রাখেন নি, পুঁথির চশমা দিয়ে জগতকে তিনি দেখেন নি, তাঁর কারবার ছিলো জীবনের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে। আর মানুষের সংস্পর্শে এসে খুব ভালো ক'রেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কোরও উপকার ক'রে তার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবার মতো এমন পাগলামি আর নেই। Life can learn only from life—এতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

কিন্তু সত্য সত্যই কি মানুষের মনে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ব'লে কিছু নেই? দুধ খেয়ে প্রতিদানে সাপ যেমন বিষ ঢেলে দেয় তেমনি উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করাই কি মানুষের আসল প্রকৃতি? তা তো মনে হয় না। কারও কাছ থেকে উপকার পেলে প্রথম যে ভাবটি আমাদের অন্তরকে অধিকার করে—সে হ'চ্ছে উপকারীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবার ইচ্ছা। উপকার যার কাছ থেকে পেলাম তার শত্রুতা করবার কল্পনা আমাদের মনের ত্রিসীমানাতেও ঘেঁসতে সাহস পায় না। কিন্তু উপকারীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মনে বলবতী থাকে না। সাহায্য-প্রাপ্তির স্মৃতি ক্রমে ক্রমে ম্লান হ'য়ে আসে আর সেই সঙ্গে উপকারীর প্রত্যুপকার করবার বাসনাও আমাদের চিত্তে ক্ষীণ থেকে ক্রমশ ক্ষীণতর হ'তে থাকে। তার পর একটা সময় আসে যখন উপকার পাওয়ার কথা আমরা একেবারেই ভুলে যাই। কখনো কখনো বিদ্যুদ্দীপ্তির মতোই চকিতের জন্য তাদের কথা জেগে ওঠে আমাদের মনের আকাশে—জীবনের পরম দুর্দ্দিনে যাদের সাহায্য এসেছিলো বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো। অবশেষে আসে সেই চরম লজ্জার মুহূর্ত্তগুলি যখন আমাদের অন্তরে কৃতজ্ঞতার বিন্দু-বিসর্গও আর অবশিষ্ট থাকে না, দুর্দ্দিনের পরম বন্ধুকে ডেকে তার কুশল পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করাও আমরা আর প্রয়োজন মনে করিনে।

যার কাছে ঋণ স্বীকার করতে অন্তরে একদিন অণুমাত্রও কুণ্ঠার উদয় হ'তো না—তার প্রতি আমরা অবশেষে এমন

উদাসীন হ'য়ে যাই কেন ? আমাদের মনের গভীরে কোথায় রয়েছে সেই সব প্রচ্ছন্ন জলধারাগুলি যারা আমাদের ভাবের চাকাগুলিকে এমন ক'রে ঘোরায় ?

মনোবিকলনতত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন যাঁরা তাঁরা বলেন, মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়ার মূলে রয়েছে তার অহমিকার আতিশয্য। আমাদের দোষগুলিকে আমরা কদাচিৎ দেখে থাকি, কিন্তু আমাদের গুণ যা আছে—তার চেয়ে অনেক বেশী গুণ আমরা আরোপ ক'রে থাকি আমাদের চরিত্রে। প্রত্যেকেই মনে করেন, তাঁর মতো এমন বুদ্ধিমান আর ভালো মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টী নেই। অন্যের শ্রেষ্ঠত্বকে সহজে আমরা স্বীকার করতে চাইনে। পরীক্ষায় প্রথম হ'তে না পেরে অনেক ছেলেই ব'লে থাকে—দিনরাত অমন বই নিয়ে থাকলে আমরাও পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'তে পারি। যে প্রথম হ'য়েছে কিছুতেই তার প্রতিভাকে স্বীকার করতে চাইবে না। বিপক্ষের জয়ের মূলে তার পৌরুষের বা বুদ্ধির কোনো দীপ্তি থাকতে পারে—এমন কথা অকপটে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে একেবারেই সহজ নয়। আমাদের পরাজয়ের জন্য আমরা দায়ী ক'রে থাকি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা, অসাবধানতা, মানসিক অবসাদ অথবা ঐ রকমের একটা ভুয়ো কারণকে। প্রতিপক্ষের সাফল্যের কথা উঠলে মুখ বেঁকিয়ে ব'লে থাকি—বিড়ালের ভাগ্যে খুব শিকে ছিঁড়েছে। বেটার বরাতের জোর আছে।— যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না ক'রে কোনো উপায় থাকে না তখনও, কিন্তু, বিপক্ষের কাছে সম্পূর্ণ পরাজয়

স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। আমরা নিজেদের জন্য এমন সব ক্ষেত্র স্বতন্ত্র ক'রে রেখে দিই যেখানে আমরা একচ্ছত্র সম্রাট। আমরা বলি, অমুক আমার চেয়ে উপন্যাস রচনায় দক্ষ বটে কিন্তু কবিতা-রাজ্যের আমি রাজা। নয়তো বলি, অমুকের মতো আমি কর্ম্মবীর নই বটে কিন্তু আমার মতো সে কি চিন্তাবীর? স্বীয় জীবনের সার্থকতাকে এই রকম ক'রে বাড়িয়ে দেখা মানুষের স্বভাব। মানুষ নইলে ভাগ্যের আঘাতকে কেমন ক'রে সইবে? জীবনের বোঝা কেমন ক'রে বইবে? লোকের কাছ থেকে ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করতে হয়—জীবনের আশাগুলি একে একে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। নিজের কাছেও নিজের যদি একটা মূল্য না থাকে তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকা যায়? তাই তো প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের 'আমি'কে এতখানি বড়ো ক'রে দেখে থাকি—কূপের ব্যাঙ আপনাকে ক্রমাগতই ফোলাতে থাকে। জগত যে একটা পাগলা গারদ—এতে কি কোনো সন্দেহ আছে? পাগলা গারদ না হ'লে নিজেদের এমন ক'রে ফাঁপিয়ে তুলে আমরা আনন্দ পাই কেন? কেন আমরা প্রত্যেকে মনে করি, আমি নইলে ভারত-উদ্ধার অসম্ভব? পৃথিবী অচল? সবাইকে বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু আমি অপরিহার্য্য?

অন্যের কাছে আমরা যে ঋণী—একথা স্বীকার করতে আমাদের বাধে কেন? বাধে আমাদের গর্ব্বে আঘাত লাগে ব'লে। আমরা অধিকাংশই যে কূপের এক—একটি ক্ষুদে ব্যাঙ। সত্য সত্যই আমাদের অধিকার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

বাহিরে আমরা কোথাও ঠাঁই পাইনে। এই অনাদরের বেদনাকে ভোলা যায় কেমন ক'রে? ভোলা যায় নিজেকে একটা প্রকাণ্ড কিছু কল্পনা ক'রে। এইজন্যই দেখা যায়, সংসারে যে মানুষের অধিকার যতো সঙ্কীর্ণ, তার ঔদ্ধত্য ততই প্রবল। আফিসে সাহেবের কাছে গলাধাক্কা খায় যে—ঘরে এসে জবরদস্ত স্বামী সেজে স্ত্রীর উপরে কর্তৃত্ব ক'রে সে বেচারা বাহিরের অপমানের জ্বালা ভুলবার চেষ্টা করে। Dr Stekel লিখেছেন,

In those cases in which individuality is crushed, a hypertrophied delusion of greatness is developed. Persons particularly prone to delusional greatness are those who suffer from certain defects and who in youth had been subjected to painful, derisive, scornful, or depreciative criticism. Amongst these we find especially the halt, the lame, the partly blind, the stutterer, the humpbacked......in short persons with some stigma.

কথাটা খুবই সত্য। আমাদের ব্যক্তিত্ব যেখানে নিষ্পেষিত হ'য়ে যায়, সেখানে স্বতঃই আমরা নিজেদের সম্পর্কে এমন বড়ো ধারণা করে বসি যার কোনো মানে হয় না। মনে করি—আমরা এক একটা কেষ্ট বিষ্টু। সেদিন এক উকীল বন্ধুর সঙ্গে একত্র আসছিলাম বাসে। সারাটা পথ জওহরলালের নিন্দে ছাড়া তিনি কথা বলবার আর কোনো বিষয় খুঁজে পেলেন না। জওহরলাল আমার বন্ধুটির পাকাধানে মই দেননি অথচ তাঁকে ছোট করবার জন্য বন্ধুর কি প্রাণপণ চেষ্টা। বাসে বন্ধুটির উপরে খুবই রাগ হয়েছিল—

কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম—রাগ করবার কোনো হেতু নেই; বন্ধুটিকে কৃপা করবার বরং যথেষ্ট কারণ আছে। বেচারার জীবনে আত্মপ্রকাশের আনন্দ নেই কোনো। ভারতবর্ষে যে নূতন জীবন আন্দোলিত হচ্ছে—জওহরলাল তার একজন স্রষ্টা, কিন্তু আমার বন্ধুটি তার একজন দর্শক এবং সমালোচক মাত্র। তার জীবন সীমাবদ্ধ পুলিশকোর্ট আর ঘরের গণ্ডির মধ্যে। বাস্তবে যাকে বইতে হয় ব্যর্থ জীবনের গ্লানি—কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সে আপনাকে ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে ক'রে তুলেছে জওহর-লালেরই একজন সমকক্ষ জীব। জওহরলালের শ্রেষ্ঠত্ব যদি স্বীকার করতে হয় তবে তো নিজের কাল্পনিক গরিমা ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং করো নেতাদের মুণ্ডপাত!

গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান গেয়ে আমাদের ক্ষুদ্রতাকে আমরা যতই ঢাকবার চেষ্টা করিনে কেন—ক্ষুদ্রতা ঢাকা পড়ে না, ঔদ্ধত্যই নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পায়। সত্যিকারের বিনয় তাদেরই চরিত্রে দেখা যায় যারা সত্যিকারের বড়ো।

The greatest number of grateful persons will be found in the ranks of the geniuses, whereas talented persons are generally addicted to ingratitude.

ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা Dr. Stekelএর এই কথাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। প্রতিভার বরপুত্র হ'য়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'য়েছেন যাঁরা, তাঁরা অন্য মানুষের কাছে তাঁদের ঋণকে [illegible] স্বীকার করেছেন। ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন তাঁরাই যাঁরা

প্রতিভা নিয়ে আসেন নি, এসেছেন কেবল বুদ্ধির প্রাচুর্য্য নিয়ে। প্রতিভাবান যাঁরা—তাঁদের মধ্যে বিনয়ের প্রাচুর্য্য দেখতে পাই কেন? কারণ অল্প জলের পুঁটিমাছ নন তাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন অগাধ জলের রুই-কাতলা। জ্ঞানের গভীরে ডুবে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, মানুষের জানবার ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ—তার শক্তি কত সসীম! 'জ্ঞান-সাগরের বেলাভূমিতে আমি মাত্র কতকগুলি উপলখণ্ড কুড়াচ্ছি'—একথা বলতে পারে নিউটনের মতোই মহাপণ্ডিত। বিদ্যা যাদের অল্প তারাই হয় dogmatic. তারা তুড়ি মেরে ভগবানকে উড়িয়ে দেয়, শাস্ত্রকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনাকুণ্ড বলে, অতীতকে বে-পরোয়াভাবে গালাগালি দেয়, মানুষের গভীরতম অধ্যাত্মচেতনাকে ফাঁকি ব'লে উপহাস করে। মানুষের জ্ঞানের সীমা যেমন সীমাবদ্ধ—শক্তির সীমাও তার তেমনি সীমাবদ্ধ! আমাদের অন্তরের গভীরে কত যে দুর্ব্বলতা লুকিয়ে আছে! কখন তারা সংযমের বাঁধ ভেঙে দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠে আর আমরা পঙ্ককুণ্ডে লুটোপুটি খেতে থাকি! যারা সত্যিকারের প্রতিভাবান তারা স্বীকার করে আপনাদের এই দুর্ব্বলতাকে—উচ্চতর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে তাদের গর্ব্বে কোনো আঘাত লাগে না।

আর একটা কারণ আছে যার জন্য অতিমানুষেরা অন্য মানুষের মহিমাকে ম্লান করবার জন্য মোটেই উদ্‌গ্রাব হয় না। যারা সত্যিকারের বড়ো—তারা মনে মনে জানে, সভ্যতার ভাণ্ডারে তাদের দান মোটেই অবহেলার সামগ্রী নয়। যারা মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে—মানুষের কাছ থেকে নিতে

তারা সঙ্কোচ বোধ করে না। মানুষের কাছে ঋণ স্বীকার করতে তারাই সঙ্কুচিত হয় যাদের পুঁজি অল্প, যাদের দেবার কিছু নেই।

আমাদের এই পাগলা গারদটাকে দেখলে সত্যি সত্যিই তাক লেগে যায়। যাদের পৃথিবীকে দেবার কিছু নেই তাদেরই মুখে শুনবে কেবল গালাগালি। মোরগের মতো ঝুঁটি কাঁপাতে কাঁপাতে চলেছে সংসারের পথ দিয়ে। গান্ধীটা মেরুদণ্ডহীন বোষ্টম, জওহরলাল নেতৃত্বাভিমানী বুদ্ধিবিলাসী, রামকৃষ্ণ পাগল, চৈতন্য অর্দ্ধোন্মাদ—এমনি ক'রে যারা বড়ো তাদের দিকে ক্রমাগত ধূলো ছড়াতে ছড়াতে চলেছে তারা, যেমন ক'রে ধূলোটের সময়ে নবদ্বীপের পথে যাত্রীরা ধূলো ছড়াতে ছড়াতে চলে। এই সঙ্কীর্ণমনা আত্মাভিমানীর দল ভালোবাসে কেবল নিজেকে। এ জগতটা তাদের কাছে একটা বিপুল আয়নার ঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। যেদিকে তাকায় দেখতে পায় কেবল নিজেকে। যে কাজ করে—তার মূলে থাকে নিজেকে প্রচার করবার কামনা। নিজেকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারে না এই নামের কাঙাল হতভাগ্যের দল। 'ভারত উদ্ধার যদি আমার দ্বারা হয় তো হোক—নইলে হ'য়ে কাজ নেই'—এই কথাই হলো এদের মনের কথা। এরা হোলো আদার গাঁয়ের শেয়াল-বাঘ—গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল।

এই গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়লের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এদের কাজ হয়েছে সকলের উপরে

নিজেদের অত্যুগ্র ক'রে তুলে ধরা—সবাইকে ছোট ক'রে নিজেদের বড়ো করে তোলা। একটু কাজ ক'রেই চার পা তুলে লাফালাফি করে আর খবরের কাগজে আচ্ছা ক'রে ঢাক পিটোয়। মানুষের মধ্যে যারা সত্যিকারের কুলীন তারা যে অন্যকে ছাপিয়ে নিজেদের বড় করতে চায় না তার একটা প্রধান কারণ, তারা জানে জগন্নাথের রশিতে সকলেরই হাত লাগাবার প্রয়োজন আছে—নইলে রথ চলবে না। এ সংসারে কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নেই—একের সঙ্গে অন্যের জীবন ওতপ্রোতভাব বিজড়িত। পশ্চাতে যাকে রাখবো—সে আমাকেই পশ্চাতে টানবে।

Gratitude is the modesty of the great, ingratitude is the vanity of the small. এ যে কত বড়ো সত্য—তা সে-ই জানে যার সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। মন যাদের বড়ো তারাই মানুষকে যথার্থ শ্রদ্ধা করতে পারে; তারাই কেবল জানে, কত মানুষের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে তবেই তারা বড়ো হবার সুযোগ পেয়েছে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্ব যাদের নিষ্পেষিত, মানুষ হিসাবে যারা অত্যন্ত ছোটো তাদেরই মধ্যে দেখা যায় বিনয়ের এবং সৌজন্যের একান্ত অভাব। নিজেদের কাজকে তারা অত্যন্ত বড়ো ক'রে দেখে—নিজেরা যা নয় তাই মনে ক'রে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

তবে একটা কথা। যেখানে কৃতজ্ঞতা সেখানেই মহত্ত্ব—এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। কৃতজ্ঞতা অনেক

ক্ষেত্রে আত্মমর্য্যাদাহীন ক্রীতদাসের অন্তরের দৈন্যেরও পরিচয় হতে পারে। সংসারে অনেক মানুষ আছে যাদের জীবনকে ভাগ্য করেছে বিড়ম্বিত। এরা কারও কাছ থেকে কিছু উপকার পেলেই অমনি কৃতার্থ হ'য়ে যায়। এদের মন সব সময়ে কৃতজ্ঞতা রসে ভরপুর থাকে। আমাদের দেশে মডারেটরা হোলো এই শ্রেণীর চিরকৃতজ্ঞ জীব। ইংরেজ আমাদের কত উপকার করেছে! বসে বসে লেজ নাড়ে আর এই চিন্তার জাবর কাটে। যারা গরীব—ধনীর দুয়ারে চেয়ে-চিন্তে কোন রকমে টিঁকে আছে—তাদের কৃতজ্ঞতার মধ্যেও রয়েছে আত্মমর্য্যাদাবোধের দৈন্য। এই রকমের কৃতজ্ঞতা মানুষকে দাসত্বের কারাগারে বেঁধে রাখবার একটা সর্ব্বনেশে শৃঙ্খল। মানুষের আত্মা এমন ক'রে কারও দয়াকে চিরকালের জন্য স্বীকার করতে চায় না। যাদের প্রাণ এই রকমের কৃতজ্ঞতার অনুভূতিকে বর্জ্জন করতে পারে না, যাদের মনের মধ্যে জ্ব'লে ওঠে না দয়ার দানের বিরুদ্ধে অসন্তোষের দাবাগ্নি—তারা সত্যসত্যই হতভাগ্য—কারণ দেহকে দু'মুঠো অন্ন দেবার জন্য আত্মার গভীর ক্রন্দনকে তারা জোর ক'রে থামিয়ে দিয়েছে।

কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে আমরা মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রাখতে চাইনে। কৃতজ্ঞতার মধ্যেও পৌরুষের স্থান আছে। জীবন-যুদ্ধে যারা পরাজিত, আত্মপ্রকাশের পথ যাদের কাছে অবরুদ্ধ, সংসারের পথে চলতে চলতে যারা ক্লান্ত—তাদের মুখেই অনেক সময়ে আমরা 'মুই অধম, মুই অধম'—এই ধরণের দাস-সুলভ বুলি শুনতে পাই। এই রকমের নম্রতার কোনো দাম

আছে ব'লে আমরা মনে করিনে। মানুষ নম্র হ'য়েও, সকলের কাছে আপনার ঋণকে অকপটে স্বীকার ক'রেও আপন মর্য্যাদাকে অম্লান রেখে সংসারের কাজ ক'রে যেতে পারে। যারা পারে—তাদেরই আমরা অতিমানুষ ব'লে থাকি। তাদের মধ্যে শৌর্য্য আর বিনয়ের সামঞ্জস্য ঘটেছে—অপরের কাছে ঋণ স্বীকার ক'রেও তারা কারও ছায়া নয়।

উপসংহারে একটা কথা ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই—যে কথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিলো। অনেক সময়ে কৃতজ্ঞতার উপরে দাবী করতে গিয়ে মানুষকে আমরা খুঁচিয়ে অকৃতজ্ঞ করে তুলি। কাউকে সাহায্য করেছো? খুব ভালো কথা; কিন্তু সাহায্যের কথা চারিদিকে গাবিয়ে বেড়ানোর তো কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ হিসাবে যা করা উচিত ছিলো—তাই করেছো। তার বেশী তো কিছু করো নি। কর্ত্তব্য ক'রে অহঙ্কারে আপনাকে স্ফীত ক'রে তোলার কোনোই মানে হয় না। ফুল যেমন ক'রে নিঃশব্দে আপনার গন্ধকে বিলিয়ে দেয়, তেমনি ক'রেই নিঃশব্দে আমাদের সেবা করা উচিত। সেবা ক'রে প্রতিদান হিসাবে আমরা যখন অন্যের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা দাবী করি তখন আমাদের কর্ম্ম হারিয়ে ফেলে তার ছন্দ আর সুর। শুধু তাই নয়। যার উপকার করি আমরা তাকে যদি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিই উপকারের কথা—তবে ফল ফলে উল্টা। উপকার যে পেয়েছে সে উপকারীর প্রতি আপনার কর্ত্তব্যের কথা শুনতে শুনতে অবশেষে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। ছেলেমেয়েকে

লেখাপড়া শিখিয়ে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করা সব বাপ-মায়েরই কর্ত্তব্য ; কারণ সন্তানকে পৃথিবীর বুকে আনার জন্য তাঁরাই দায়ী। তা সত্ত্বেও অনেক বাপ-মাকে বলতে শোনা যায়, তোকে খাইয়ে দাইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে এত বড় করলাম আর আমার প্রতি তোর এই ব্যবহার! যেহেতু ছেলেকে মাইনে দিয়ে স্কুলে পড়িয়েছেন আর ভাত-কাপড় দিয়ে মানুষ করেছেন সেই হেতু পুত্রের উচিত আজীবন বাপ-মায়ের ছায়া আর প্রতিধ্বনি হ'য়ে থাকা—এই কথা ক্রমাগত শুনতে শুনতে ছেলের মন যায় ক্ষিপ্ত হয়ে ; হৃদয়ে বাপমায়ের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা ছিলো তা একদিন কর্পূরের মতো উবে যায়। কৃতজ্ঞতা কৃতঘ্নতায় এসে দাঁড়ায়। Dr. Stekel বলছেন,

Should we not rather strive to hold our children with only one bond, love ?

অর্থাৎ আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে রাখবার জন্য একটা মাত্র বন্ধনের আশ্রয় নেওয়া কি আমাদের উচিত নয়—প্রেমের বন্ধনের? ডাঃ ষ্টিকেলের মতের প্রতিধ্বনি করবেন সবাই।

বুকের বোঝা

আমাদের মন স্পঞ্জের মতো। স্পঞ্জ নিজের মধ্যে যেমন জল টেনে নেয়, আমাদের মনও তেমনি অনেক রকমের ধারণা দিয়ে আপনাকে পূর্ণ ক'রে তোলে। নতুন জলকে টানতে হ'লে স্পঞ্জকে নিংড়ে ফেলার প্রয়োজন আছে। নতুন চিন্তাকে গ্রহণ করতে হ'লে আমাদের মনকেও খালি ক'রে ফেলা চাই। যে সব ক্ষেত্রে আমরা বুকের বোঝা নামাতে পারিনে—সে সব ক্ষেত্রে মনের স্বাস্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলি। তাদেরই মন অসুস্থ হ'য়ে পড়ে যারা হৃদয়ের গোপনে পুষে রাখে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বেদনাকে। মনের যতরকমের ব্যাধি আছে, তাদের সকলেরই মূলে রয়েছে এমন কোনো গোপন কথা যাকে ম'রে গেলেও আমরা প্রকাশ করতে পারিনে।

এই জন্যই মনকে যারা খালি ক'রে ফেলতে পারে—তারা ভাগ্যবান। দুর্ভাগ্য তারাই যাদের পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে গিয়ে মনের ভারকে তারা স্বচ্ছন্দে নামিয়ে দিতে পারে। হৃদয়ের গোপন কথাকে ব্যক্ত করবার নিয়ম আছে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে। (বৌদ্ধ সঙ্ঘেও এই নিয়ম ছিল।) এ নিয়ম খুব ভালো। পুরোহিতের কাছে অন্তরের গূঢ় বেদনাকে মাঝে মাঝে ব্যক্ত ক'রে অনেক মানুষ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এমন ক'রে কারও কাছে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন

ব্যথাকে যদি তারা ব্যক্ত করতে না পারতো—বেদনার দুর্ব্বহ বোঝার ভারে জীবন তাদের ভেঙে পড়তো। ডাঃ মুথম্যান (Dr. Muthmann) একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে সব দেশের লোক প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মাবলম্বী, সেই সব দেশে আত্মঘাতীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে রোমান ক্যাথলিক [illegible]বলম্বীদের মধ্যে আত্মঘাতীর সংখ্যা অনেক কম। ডাঃ মুথম্যানের মতে রোমান ক্যাথলিকেরা ধর্ম্মযাজকদের কাছে মাঝে মাঝে হৃদয়ের বোঝাকে নামিয়ে দেবার সুযোগ পায় ব'লেই তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি এত ক্ষীণ!

আমাদের মনের নানাবিধ ব্যাধির মূলে কি আমাদের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কামনাগুলিকে আমরা আবিষ্কার করিনে? যে সব ধারণাকে আমরা মনের মধ্যে স্থান দিতে চাইনে—সে-গুলোকে আমরা প্রাণপণে ভুলে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভুলে যাওয়া তো সহজ নয়। পুরোপুরি যদি ভুলে যেতে পারতাম তবে তো গোল মিটেই যেতো। কিন্তু যাকে ভুলতে চাই তাকে যে খানিকটা ভুলি আর খানিকটা ভুলিনে। যে ধারণাকে ভুলবার চেষ্টা করি সে গিয়ে বাসা নেয় আমাদের মনের নির্জ্জন প্রদেশে আর ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে—কোথাও বা কোনো উৎকট আচরণের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা কোনো স্নায়বিক ব্যাধির মূর্ত্তিতে। মনোবিকলনতত্ত্ব বলে, অবাঞ্ছিত ধারণাকে ভুলবার চেষ্টা করতে গিয়ে যেখানে আমরা জীবনে এই রকম গণ্ডগোল বাধিয়ে বসি সেখানে মানসিক

ব্যাধির কবল থেকে চিত্তকে মুক্ত করবার উপায় হচ্ছে আপনাকে সম্যকরূপে জানা। কিন্তু নিজের যথার্থ রূপকে আমরা জানতে তো চাইনে। আমাদের মনের গভীরে যে কলুষ, যে ফাঁকি আত্মগোপন ক'রে থাকে তাকে যথাসম্ভব অস্বীকার ক'রে চলাই আমাদের স্বভাব। যে মুহূর্ত্তে নিজের কাছে নিজের দুর্ব্বলতাকে অকপটে স্বীকার করি আমরা, সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে নিজের জানা সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে আর এই আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রেই মনের হারানো স্বাস্থ্যকে আমরা ফিরে পাই। নিজের কাছে নিজের দুর্ব্বলতাকে আমরা যদি ব্যক্ত করতে পারতাম, তবে জীবনে এত বিড়ম্বনা আমাদের কখনোই ভোগ করতে হোতো না। কিন্তু নিজেকে নিজের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রাখবার দুর্ব্বলতা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে! মনের অনেক গোপন কথাকে আমরা নিজের কাছ থেকেও সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চাই। তারপর ছদ্মবেশী দুর্ব্বলতা কোন্ এক মুহূর্ত্তে প্রবল হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে নিজ-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আর আমরা পাপের পঙ্কে তখন লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করি। ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্বের একটা প্রকাণ্ড দান হচ্ছে—মানুষের মন আজ নিজেকে সম্যকরূপে জানবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

প্রত্যেকটি হৃদয় যেমন আপনার গোপন কথাকে নিজের কাছ থেকেও সযত্নে ঢেকে ঢেকে চলেছে—তেমনি নিজেকে কোনো প্রিয় জনের কাছে অবারিত ক'রে দেওয়ার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বাভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

কোনো বেদনাকে বহন ক'রে যখন আমাদের চলতে হয় তখন সেই বেদনার দুঃসহভারে আমরা প্রায় ভেঙে পড়ি। যতক্ষণ না আমরা হৃদয়ের গোপন কথাকে কারও কাছে ব্যক্ত করতে পারি ততক্ষণ আমাদের মন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে। যাঁরা ডস্‌টয়েভ্‌স্কির (Dostoyevsky) Crime And Punishment পড়েছেন তাঁরাই জানেন, অপরাধ ক'রে পুলিশের কাছে ধরা না পড়লেও অপরাধীর শাস্তি কত নিষ্ঠুর হতে পারে। বিবেকের দংশনে অস্থির হ'য়ে নারীহন্তা যুবককে শেষপর্য্যন্ত পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি ক'রে অনুশোচনার নরক-যন্ত্রণার হাত থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে হয়েছে। নাথানিয়েল হথর্ণের Scarlet Letter নামক অনুপম উপন্যাসখানি পড়বার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাও জানেন—হৃদয়ের মধ্যে গোপন-পাপের বেদনাকে বহন ক'রে বেড়ানোর বেদনা কি মর্ম্মন্তুদ! অপরাধী পুরোহিত সমাজের কাছ থেকে কোন শাস্তি না পেয়েও সাত বছর ধ'রে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে আত্মগ্লানি ভোগ করেছে তার তুলনায় ব্যভিচারিণী নারী সমাজের কাছ থেকে যে দুঃখ পেয়েছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অপরাধকে যখন আমরা স্বীকার করতে পারিনে কারও কাছে—তখন আত্মগ্লানি জগদ্দলশিলার মতোই আমাদের মনের উপরে নিরন্তর চেপে থাকে। পাপ ক'রে যখন সমাজের ভয়ে আমাদের অপরাধকে অনুক্ষণ ঢেকে ঢেকে চলতে হয় তখন কালিমাকে গোপন ক'রে চলবার সেই দুঃসহ আত্মগ্লানির মধ্যেই আমাদের পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যায়।

আমরা গোপনে যে পাপ করি তার কথা সকলের কাছ থেকে ঢেকে রাখার যাতনা কি দুর্ব্বহ, তা আমরা জানি ব'লেই বুকের বোঝা কারও কাছে নামিয়ে দেবার জন্য এমন ছটফট করি আমরা। আমরা যখন প্রকাশ্যে আমাদের অপরাধকে স্বীকার করতে পারিনে—তখন অপ্রকাশ্য পথে তাকে স্বীকার করি। প্রচ্ছন্ন উপায়ে গোপন পাপকে কেমন ক'রে আমরা ঘোষণা করি—তার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন Dr. William Stekel তাঁর The Depths Of The Soul নামক বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি উল্লেখ করেছেন একজন ব্যভিচারিণী নারীর স্বীকারোক্তির কাহিনী। গোপনে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করবার পরে মেয়েটি হ'য়ে পড়লো শুচিবায়ুগ্রস্তা। হাত ধোয়া আর হাত মোছার বিরাম নেই। বাহিরের শুচিতা নিয়ে এই যে বাড়াবাড়ি—এই বাড়াবাড়ির হেতু কি? হেতু হচ্ছে 'আমি পাপ করেছি—আমি অশুচি'—অন্তরের মধ্যে এই অনুভূতির আধিপত্য। ব্যভিচারের অপরাধকে প্রকাশ্যে স্বীকার করবার ক্ষমতা ছিল না তার। সে মনে মনে কতবার তার স্বামীকে এবং স্বামীর পরিজনবর্গকে লক্ষ্য ক'রে বলেছে, 'ওগো আমায় ছুঁয়োনা তোমরা—আমি অশুচি, আমি পাপীয়সী, আমি কলঙ্কিনী।' রসনায় যে কথা শতবার বলতে গিয়েও লজ্জায় বলতে পারেনি সে, শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীর আচরণে বারম্বার প্রকাশ পেয়েছে অন্তরের সেই স্বীকারোক্তি। কারণে অকারণে এই হাত ধোয়ার বাড়াবাড়ির মধ্যে অন্য লোক দেখবে শুধু বহিঃশৌচের প্রতি নারীর অনুরাগের আতিশয্য। মনোবিকলন-

তত্ত্বের চোখে কিন্তু এই রকম আচরণ ভাষাহীন স্বীকারোক্তি (speech without words) ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা অনেক সময়ে এই রকম প্রচ্ছন্ন উপায়কে আশ্রয় ক'রে আমাদের অন্তরের গোপন কথাকে প্রকাশ ক'রে থাকি।

যার কাছে গিয়ে আমরা বুকের বোঝা অনায়াসে নামাতে পারি—তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার কোনো অন্ত থাকে না। আত্মভোলা, নম্র, ধর্ম্মপরায়ণ সন্ন্যাসীরা লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাছে এতখানি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন কেন? কারণ তাঁদের কাছে গিয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে আমাদের মনের গভীরতম ব্যথাকে আমরা ব্যক্ত করতে পারি। তাঁদের পায়ের কাছে দুশ্চিন্তার দুর্ব্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমরা আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত মনে করি। নদী যেমন আপনার জলধারাকে সমুদ্র-গর্ভে সঁপে দেয়, তেমনি করেই তাঁদের কাছে আমাদের মনের সমস্ত গোপন কথাকে আমরা উজার ক'রে সঁপে দিই। যে মানুষ আর একজনের কাছে আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে—সে নিজের অন্তরের দুর্ব্বহ ব্যথার বোঝা থেকে মুক্তি পায়; যে পুরুষ অথবা যে নারী নিজের কাছে নিজের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করেছে অকপটে—তার মনের মধ্যে আর কোনো গলদ থাকতে পারে না।

কত উপায়েই না আমরা নিজের অন্তরের গোপন কথাগুলিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে থাকি। আমরা যে পর্দ্দায় বিয়োগান্ত নাটক দেখবার জন্য দলে দলে এমন ক'রে ছুটে যাই—সে কিসের জন্য? কাঁদবার জন্য, প্রাণ খুলে কেঁদে আমাদের

হৃদয়ের বোঝাকে হাল্কা করবার জন্য। নায়কের বেদনায় বিচলিত হয়ে আমরা যখন অঝোরে অশ্রুমোচন করি—সে অশ্রুধারার মধ্যে কি আমাদেরই গোপন মর্ম্মবেদনাকে আমরা প্রকাশ করিনে? দেবদাসের জীবনের ছবিগুলি আলোহীন প্রেক্ষা-গৃহে বহু হৃদয়ের রুদ্ধবেদনার উৎসমুখ যখন খুলে দেয় তখন দর্শকদের অনেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নিজেদেরই প্রেমের জীবনের ব্যর্থতাকে স্মরণ ক'রে। অভিনয়ের সার্থকতা হোলো সেখানে যেখানে অভিনয় দেখতে দেখতে আমাদের মনের বদ্ধ কপাটগুলি খুলে যায়—আমাদের অন্তরের রুদ্ধ আবেগ হাসি আর অশ্রু আর বিস্ময়ের মধ্যে মুক্তি পায়। অভিনয়-গৃহ হ'লো আমাদের মনের গোপন কথাকে ব্যক্ত করবার একটি উৎকৃষ্ট স্থান। যে সব চিন্তাকে মনের ত্রিসীমানায় আমরা ঘেঁসতে দিইনে—অভিনয় দেখতে দেখতে সেই সব চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে; অভিনয় আমাদের মনে জীবন্ত ক'রে তোলে বিগত দিনের অনেক ঘুমন্ত স্মৃতিকে; আমাদের হৃদয়ের অনেক ক্ষত স্থানের উপরে মাখিয়ে দেয় সান্ত্বনার প্রলেপ; যা অসম্ভব বলে মনে হোত তার প্রাপ্তির আশাকে অন্তরে জাগিয়ে দেয়। অভিনয়-গৃহে যেমন আমরা অন্তরের গোপন বেদনাকে ও কামনাকে ব্যক্ত করি—তেমনি সাহিত্য এবং সঙ্গীতও আমাদের হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারগুলিকে একে একে উদ্ঘাটিত ক'রে দেয়। বই পড়তে পড়তে, গান শুনতে শুনতে আমরা কাঁদি, হাসি, কত রকম ভাবের প্লাবনে ভেসে যাই। সেই কান্না-হাসির মধ্যে আমাদের মনের গোপন চেহারাই কি ফুটে ওঠে না?

আমাদের মধ্যে যে সব কথা সঞ্চিত হয়ে থাকে—তাদের ব্যক্ত করতে না পারলে সত্য সত্যই আমরা হাঁপিয়ে উঠি। বিদেশে আমরা যখন গাঁয়ের কোন লোককে দেখতে পাই, আনন্দে আমাদের মন লাফিয়ে ওঠে। আমরা তার সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ জমাই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কথা ব'লেও আমাদের কথার পুঁজি ফুরোতে চায় না। গ্রামে একত্র বাস করার সময় যার সঙ্গে দিনে তুটো কথাও হ'তো না—প্রবাসে তার সঙ্গ এমন মধুময় ব'লে মনে হয় কেন? কারণ তার সাহচর্য্য মনের রুদ্ধ আবেগকে বাক্যের মধ্যে মুক্তি দেয়। যে কথা প্রকাশের জন্য মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করছিলো—পরিচিত মানুষের সঙ্গ পেয়ে সে কথা বাঁধ-ভাঙা নদীর মতো অন্তরের গুহা থেকে প্রবল স্রোতে বেরিয়ে আসে। মনের বোঝা হাল্কা করতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী পারদর্শী। তাদের বন্ধু খুঁজে নিতে আদৌ বেগ পেতে হয় না। যাকে মনে লেগে গেলো তার সঙ্গেই গলাগলি ভাব—তার কাছেই মনের কথা খুলে বলে। আমরা বয়স্কেরা যাকে-তাকে সহজে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনে। কাউকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তার সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের ভেবে দেখতে হয়। আমাদের মনের গোপনতম অনুভূতিকে, কিন্তু, আমরা সহজে কারও কাছে প্রকাশ করিনে। আমাদের না জানিয়ে সহসা কখন জীবনে আসে এক একটা ভাবের বন্যা। সে বন্যা আমাদের হৃদয়ের দরজাগুলিকে অকস্মাৎ খুলে দেয়। যে সব কথা অন্তরের

মণিকোঠায় আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে গোপন ক'রে রেখেছিলাম—সেই সব কথা মনের আবেগে আমরা প্রকাশ ক'রে ফেলি। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের গোপন ভালোবাসার কথা এমনি করেই একদিন মুমূর্ষু সৈনিকের মুখ থেকে সহসা বেরিয়ে এসেছিল সন্ন্যাসীর প্রশ্নের ধাক্কা খেয়ে।

আমরা ঘরের মধ্যে, ঘরের বাইরে যে সব বক্তৃতা দিই, তার মধ্যেও কি আমাদের অন্তরের গোপন কথা লুকানো থাকে না? শ্রোতাদের মুখের দিকে চেয়ে আমরা অনেক কথা বলি বটে—কিন্তু আসলে সে সব কথার মধ্যে লুকানো থাকে নিজেদেরই গভীর মনের অনেক স্বীকারোক্তি। বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নিজেরই বুকের বোঝাকে হাল্কা করেন। আমরা যখন এক বালতি জলের মধ্যে রঙ গুলি—সে রঙ জলের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে যায় যে খালি চোখে রঙের গুঁড়া আমরা দেখতে পাইনে। আমাদের বক্তৃতার মধ্যে আমাদের গোপন 'আমি'ও জলের মধ্যে রঙের মতো অদৃশ্যভাবে মিশিয়ে থাকে। সেই 'আমি'র প্রচ্ছন্ন রূপকে দেখা না গেলেও আমাদের বাক্য-স্রোতের মধ্যে আমাদেরই মনের গোপন কথা যে ছড়িয়ে থাকে—এবিষয়ে কোনই সংশয় নেই।

সমাপ্ত